একক ৩৭ ❑ কপালকুণ্ডলা ঃ উপন্যাস পাঠ

গঠন

৩৭.১ উদ্দেশ্য

৩৭.২ প্রস্তাবনা

৩৭.৩ ‘কপালকুণ্ডলা’-র কাহিনীর উৎস সন্ধানে

৩৭.৩.১ কাহিনী সংক্ষেপ

৩৭.৩.২ ‘কপালকুণ্ডলা’ উপসংহার

৩৭.৩.৩ কাহিনী-বিশ্লেষণ

৩৭.৪ উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

৩৭.৪.১ উপকাহিনীর অন্যান্য উপযোগিতা

৩৭.৪.২ ‘কপালকুণ্ডলা’র উপকাহিনী

৩৭.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

৩৭.৫ ‘কপালকুণ্ডলা’র বৃত্তগঠন

৩৭.৬ ‘কপালকুণ্ডলা’র অতিপ্রাকৃত উপাদান

৩৭.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

৩৭.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

৩৭.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনী

৩৭.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

৩৭.৮ সার-সংক্ষেপ

৩৭.৯ ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি

৩৭.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

৩৭.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

৩৭.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

৩৭.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

৩৭.১০ সার-সংক্ষেপ

৩৭.১১ ‘কপালকুণ্ডলা’র শ্রেণীবিচার

৩৭.১১.১ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্য

৩৭.১১.২ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি উপন্যাস

৩৭.১১.৩ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি রোমান্স

৩৭.১১.৪ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

৩৭.১২ সারাংশ

৩৭.১৩ অনুশীলনী
৩৭.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী
৩৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী
৩৭.১৫ উত্তরমালা
৩৭.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর উত্তরমালা

৩৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যানভাগ কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, এই কাহিনীর কতখানি বাস্তব ঘটনা, কতটা লেখকের নিজস্ব কল্পনা সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- কাহিনীর উপস্থাপনায় বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রাবলীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা জানতে পারবেন।
- কাহিনীর সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত নির্মাণ রীতি এবং অতিপ্রাকৃত ও বাস্তব উপাদানের অনুপাতিক বিন্যাসে কিভাবে একে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- কাহিনীতে প্রধান পাত্রপাত্রী এবং অপ্রধান চরিত্রাবলী কী ভূমিকা পালন করেছে, তা বুঝতে পারবেন।
- উপন্যাসের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী 'কপালকুণ্ডলা'র বৈশিষ্ট্য বিচার করতে পারবেন।

৩৭.২ প্রস্তাবনা

একটি উপন্যাসকে বি(-ষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলে আলোচনার আওতায় আনা প্রয়োজন মূলতঃ তিনটি বিষয়—এর কাহিনী অংশ, এর চরিত্রনির্মাণ এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতি। উপন্যাসের গল্পটি পরিবেশিত হয় নানা ঘটনার কার্যকারণে শৃঙ্খলে বাঁধা থেকে, বিভিন্ন চরিত্রের ত্রি(য়াকলাপ ও সংলাপকে অবলম্বন করে, লেখকের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনার আলোকে আলোকিত হয়ে। উপন্যাস পাঠের সময় তাই আপনাদের এই তিনটি প্রধান বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক।

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী কিছুটা বাস্তব, কিছুটা লেখকের কল্পনা এবং নিজস্ব জিজ্ঞাসাপ্রসূত ঘটনা। এর চরিত্রাবলীও কখনও বাস্তব মানুষের আদলে নির্মিত, (নবকুমার) কখনও অন্য সাহিত্যিক-প্রেরণাসঞ্জাত (কপালকুণ্ডলা), কখনও আবার ইতিহাসসম্ভাব্য (মতিবিবি)। এরা অধিকাংশ সময়েই আমাদের পরিচিত মানবজগতের সঙ্গে সদৃশ, যদি বা এরা কখনও ভিন্ন পথে বিচরণ করে, তবে সেটি লেখকের নিজের দর্শন, মতামত, উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই। আসুন, উপন্যাসটির সামগ্রিক বি(-ষণে আমরা এর কাহিনী, চরিত্রায়ণ এবং লেখকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ব্যাপারটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

৩৭.৩ 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীর উৎস সন্ধানে

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি এমনই একটি সৃষ্টি যে বহু সমালোচকই এর উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেছেন। সেই সময়ের এবং পরবর্তী কালের অনেক আলোচকই মনে করেন, এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাস যে

অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তা বোঝা যায় বহুভাষায় এর অনুবাদ দেখে। ইংরেজিতে অনুবাদ তো বেশ কয়েকবার হয়েছে তা ছাড়া ১৮৮৬ সালে অধ্যাপক ক্লেম জার্মান ভাষায় এটি অনুবাদ করেন। ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে এটি মঞ্চস্থ করেন প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে অন্য নাট্যকারও এর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এর কাহিনীটি তখন এতই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল যে অপর একজন সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই এদের নিয়ে আবার নতুন করে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম 'মৃন্ময়ী'। এ থেকেই বুঝতে পারবেন তখনকার সাহিত্যিকরাও এই উপন্যাস পড়ে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এই যে সকলে মুগ্ধ হচ্ছেন উপন্যাস পড়ে, সেতো লেখার গুণে বটেই, কিন্তু এর বিষয়টাও এমন অভিনব যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় এমন একটা চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র পেলেন কোথা থেকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের লেখা 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়াতে (এখন যা কাঁথি নামে পরিচিত) বদলি হন তখন তাঁর সমুদ্র তীরের বাংলোতে প্রতিদিন গভীর রাতে এক কাপালিকের উদয় হতো। সে থাকতো সমুদ্রতীরের গভীর জঙ্গলে। এই কাপালিককে নিয়ে তিনি যে বেশ চিন্তা ভাবনা করতেন সে কথা বোঝা যায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে করা একটি প্র(থেকে—'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?'

প্রান্তলিপি

এই উপন্যাসের বিষয় এতোই নতুন রকমের মনে হয়েছে যে লণ্ডন থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে আর. ডাব্লিউ ফ্রেজার কী দা(ণ প্রশংসা করেছেন এর, সেটাও আপনাদের জেনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছেন—"Outside in 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history to western fiction."

এ প্র(ের উত্তর দীনবন্ধু মিত্র কিছু দেননি, দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, তিনি বলেছিলেন—'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে(সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।' এই মন্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ হয়নি, পূর্ণচন্দ্র তাঁর গ্রন্থেই সে কথা বলেছেন। উপন্যাসটি পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন, পূর্ণচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু সমাধান যেরকমই হোক, সমস্যাটা যে বেশ অভিনব তা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছে। খানিকটা এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় কালিদাসের সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-য়। সেখানে আশ্রমে প্রতিপালিতা শকুন্তলা কণ্বমুনি আর আশ্রমবালক ছাড়া অন্য কোন পু(ষ চোখে দেখেনি, প্রথম দেখল রাজা দুষ্মন্তকে। শেক্সপীয়রের 'দা টেম্পেস্ট' নাটকে মিরান্ডারও প্রায় এই ভাবেই নির্জন দ্বীপে শৈশব কেটেছে। সমালোচক ফ্রেজার যে উপন্যাসটির নাম করেছেন, সেই উপন্যাসের লেখক পিয়ের লোতিও দেখিয়েছেন এইরকম একটি মেয়েদের দ্বীপে প্রথম পু(ষের আগমন। যাইহোক, সং(পে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীটা আপনাদের জানিয়ে রাখি, যাতে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যার কী সমাধান করলেন।

৩৭.৩.১ কাহিনী-সংক্ষেপ

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির কলেবর খুব বেশি নয়, গল্পে নাটকীয় উত্থান পতন থাকলেও কাহিনী খুব জটিল নয়। নবকুমার এই কাহিনীর নায়ক। সপ্তগ্রামে তার বাড়ি। মূল ঘটনা আড়াইশো বছর আগেকার কথা, তাই সপ্তগ্রাম তখন জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। গঙ্গাসাগরের মেলা থেকে ফেরবার সময় দিগ্‌ভ্রান্ত একদল যাত্রীর মধ্যে নবকুমারও ছিল। কোনরকমে একটা চরে নৌকা ভিড়লে রান্নার উদ্যোগ শু(হল। কাঠ নেই বলে নবকুমার একা গেল কাঠ কাটতে, কিন্তু তার আগেই জোয়ারে নৌকা ভেসে গেল। নবকুমার সেই চড়ে পরিত্যক্ত(হল।

সেই চরে থাকতো এক কাপালিক আর একটি যুবতী মেয়ে কপালকুণ্ডলা। আসলে সে ব্রাহ্মণকন্যা, দৈবদুর্ঘটনার অতি শৈশবে সেই চরে নির্বাসিত। কাপালিক নিজের স্বার্থেই তাকে লালন করেছে। কাপালিক বধের জন্য একটি মানুষ পেয়ে খুব খুশি, নবকুমারকে বন্দী করে রাখল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মায়া হল, সে তাকে মুক্ত(করে নিয়ে এল ভৈরবী মন্দিরে পুরোহিত অধিকারীর কাছে। কাপালিকের রোষ থেকে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাবার জন্য অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সপ্তগ্রাম পাঠাবার জন্য মেদিনীপুর পর্যন্ত দিয়ে এলেন।

সপ্তগ্রাম যাবার পথেই দেখা হয় নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মবতীর সঙ্গে, কিন্তু নবকুমার তাকে চিনতে পারে না। পাঠানের হাতে পড়ে পদ্মাবতীর পরিবারের সকলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বলে নবকুমারের সঙ্গে তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পদ্মাবতী লুৎফা-উন্নিসা নাম নিয়ে মোগল রাজদরবারে সেলিমের খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছে। বাইরে, তার নাম মতিবিবি। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, গা ভর্তি গহনা সে দেয় কপালকুণ্ডলাকে, কপালকুণ্ডলা তা আবার দান করে ভিখারীকে।

অচেনা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলে যে ধরনের সমস্যা হবার কথা, তা হয়না, নবকুমার জীবন্ত ফিরে আসার আনন্দে সব চাপা পড়ে যায়। কিন্তু কিছু দিন পার নবকুমারের বিবাহিতা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি, কপালকুণ্ডলার কোন পরিবর্তন হয়নি, আগের জীবনই তার কাম্য ছিল।

এরপর কাহিনী কপালকুণ্ডলাকে ত্যাগ করে মতিবিবির আখ্যান বর্ণনা করতে বসে। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী রাজা মানসিংহের ভগিনী এবং সেই ভগিনীর প্রধানা সহচরী হিসাবে লুৎফা-উন্নিসা সেলিমকেও তৃপ্তি দান করতো। আকবর মৃত্যুশয্যায় বলে সেলিমই সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু সেলিম যে গোপনে শের আফগানের স্ত্রী মেহের-উন্নিসার প্রতি প্রণয়াসক্ত(া, সে কথা জানতো মতিবিবি। ফলে খস(কে সিংহাসনে বসাবার একটা ষড়যন্ত্র করে সে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এরপর মেহের-উন্নিসার কাছে গিয়ে সেলিম সম্বন্ধে তার মন জানতে চেষ্টা করে মতিবিবি। শেষে মেহের ঘোর প্রণয়াসক্ত(। সে কথা সেলিমকে সে জানালে সেলিম অবশ্য উপপত্নী হিসাবে তাকে কাছে রাখতে চায়, কিন্তু সে নিজের স্বামীর ওপর অধিকার কায়েম করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বিতাড়িত করতে সপ্তগ্রামে আসে। এর কাপালিককেও সেখানে পেয়ে গেল। দুজনের উদ্দেশ্য একই।

এক বছরের বিবাহিত জীবন কাটার পর কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্তন হলেও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে তার প্রতি অনুরক্ত(করার জন্য বন থেকে গভীর রাতে ওষুধ খোঁজার জন্য পাঠায় মৃন্ময়ী বা কপালকুণ্ডলাকে। মতিবিবি ও কাপালিকের পরামর্শ শুনে ফেলে সে, কাপালিককে দেখেও ফেলে এক

ঝলক। স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা নিজের নিয়তি দেখতে পায়। ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবি চিঠি দেয় তাকে আবার দেখা করার জন্য। সেই অনুযায়ী সে যায়, কিন্তু সেই চিঠি নবকুমারের হাতে পড়লে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে কপালকুণ্ডলাকে অনুসরণ করতে যাওয়ার কাপালিকের সঙ্গে দেখা হয়। ভগ্নবাহু কাপালিক মৃণ্ময়ীকে ভৈরবীর কাছে বলিদানে নবকুমারের সাহায্য চায় এবং মদ্যপানে তাকে উন্মত্ত করে ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে মৃণ্ময়ীর মিথ্যা দ্বিচারিতার দৃশ্য দেখায়। নবকুমারই মৃণ্ময়ীকে বধ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাড় ভেঙে মৃণ্ময়ী জলে পড়ে। নবকুমার তাকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপ দেয়। দুজনেই তলিয়ে যায়।

৩৭.৩.২ কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যটি এইরকম ছিল—'সেই অনন্তগঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, 'বসন্তবায়ুবি(প্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'

এটা কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণে আছে। আপনারা সন্ধান করলে দেখতে পাবেন, প্রথম সংস্করণে অর্থাৎ উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এর পরেও খানিকটা অংশ ছিল। সেই অংশটুকু এইরকম ঃ ''(কাপালিক) লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কুলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্ন আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুণরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিঃ(াস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল 'মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!'

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃণ্ময়ী কোথায়?' নবকুমার উত্তর করিলেন, 'মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি!'

এই দুটি উপসংহারের মধ্যে কোন্‌টি আপনাদের মতে সুন্দর এবং যুক্তি(সংগত, ভেবে দেখতে পারেন। আমার বিবেচনায়, শাস্তি যদি পেতেই হয়, দুজনেরই পাওয়া উচিত, একা কপালকুণ্ডলার নয়। তাছাড়া অন্যায় তো বেশি করেছে নবকুমারই। কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকার করবার জন্যই বেরিয়েছিল, আগের দিন কাপালিককে দেখা সত্ত্বেও(কথা বলেছিল ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে। অথচ সেই অপরাধে নিজে তাকে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে নবকুমার কাপালিকের নির্দেশ অনুসারে তাকে বলি দিতে গিয়েছিল। বিনা অপরাধে মৃণ্ময়ীর মৃত্যু যদি ঔপন্যাসিক দেখাতে পারেন, তবে অপরাধ করে নবকুমারের বেঁচে যাওয়া পাঠক হিসাবে আমাদের কিছুতেই যুক্তি(সংগত হতো না বলে মনে হয়। তাই, মনে হয় আপনারাও একমত হবেন যে, বর্তমান সমাপ্তিটিই উপন্যাসের প(সঠিক হয়েছে—যা হবার দুজনের একসঙ্গেই হয়েছে, এবং সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩৭.৩.৩ কাহিনী-বিশ্লেষণ

আপনারা উপসংহার নিয়ে যেরকম ভাবনাচিন্তা করলেন, সেই ভাবেই একবার ভাবতে পারেন গোটা কাহিনীটা নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় যে চিন্তাটা এসেছিল, আমরা তা জানি। সেই চিন্তাটাকে রূপ দেবার জন্যই তিনি 'রসুলপুরের নদীর' বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি এবং অরণ্যসংকুল অঞ্চলে মৃণ্ময়ীর আশৈশব প্রতিপালনের কথা ভেবেছিলেন। কোনসময় নৌকাডুবি হয়ে একটি শিশু সেখানে উপস্থিত হতেই পারে এবং কাপালিক তাকে আশ্রয় দিয়েছে এমন ঘটনাও স্বাভাবিক। মৃণ্ময়ী বা কপালকুণ্ডলা কখনই কোন যুবা-পু(ষের মুখ দেখেনি,

এটা অবশ্য ঠিক নয়—অধিকারীর শিষ্যেরা কখনও কখনও এসেছে। তবে সভ্য সমাজের নিয়মকানুন জানা বা স্বামী ও বিবাহ সম্বন্ধে কোন ধারণা তার অবশ্য থাকার কথা নয়।

নবকুমার সেইরকম একটি জায়গায় নিতান্ত পরিস্থিতি বিপর্যয়েই গিয়ে পড়েছিল এবং যেরকম ঘটনা ঘটতে শু(করেছিল তাতে নবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সভ্য সমাজে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া অধিকারীর আর কিছু করবারও ছিল না বোধ হয়। অর্থাৎ এইরকম একটি লোকালয় ও সভ্য সমাজের সংস্রব বর্জিত মেয়ের বিয়ে দেওয়া হল।

এরপরে যা হতে পারে বলে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন তা যে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি, সেটা আমরা পরবর্তী কাহিনী থেকেই বুঝতে পারি। মৃণ্ময়ীকে পেয়ে নবকুমার যে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখতে লাগল, সব কিছুই তার কাছে সুন্দর হয়ে গেল, এ কথা লেখক বলেছেন, কারণ—'প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।'

অথচ কপালকুণ্ডলার তিলমাত্র পরিবর্তন এই প্রণয় ঘটাতে পারেনি। নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরী তাকে সুন্দর করে চুল বেঁধে দিতে চেয়েছে, অলংকারে ভূষিত করতে চেয়ছে, এমন কী সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে', একথাও বলেছে, তার পরেও কপালকুণ্ডলা বলেছে, 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

আমরা বিবাহের এক বছর পরেও কপালকুণ্ডলাকে দেখেছি। তখনও সংসারের দিকে তার কোন মন নেই, নবকুমারের প্রতি বিশেষ প্রণয় নেই, দাম্পত্য জীবনেও কোন লোভ নেই। কাজেই মনে হয় জীবনের প্রথম যোল বছর এইভাবে কাপালিকের কাছে লালিত হলে সংসার আর তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না, এইরকম একটা চিন্তাই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল। অন্তত কাহিনী থেকে সেরকমই মনে হয়। চরিত্রের প(এই ব্যাপারটা বি্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা আমরা কিছুটা পরে বিচার করবো। এখন একটা অন্য ব্যাপার ল(্য করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র যে চিন্তার কথা উপন্যাস লেখার আগে কারো কারো কাছে খুলে বলেছেন সেখানে কিন্তু শুধু মেয়েটির কথাই ছিল, তাকে বিবাহ করে যে সভ্যসমাজে নিয়ে যাবে তার আর একপ(আগে ছিল, কিম্বা তার বিবাহিত বোনকে স্বামী বিশেষ সম্মান বা ভালবাসা দেয় না, এসব কথা ছিল না। এসব যে উপন্যাসে এসেছে, তাই নয়, কপালকুণ্ডলার জীবন এবং পরিণতির সঙ্গে এরা একেবারে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। এটা কেন হল, আপনাদের একটু চিন্তা করে দেখতে হবে।

৩৭.৪ উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

যে কোন উপন্যাস লেখার সময় মূল কাহিনী তো একটা থাকেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রধান আরো দুটো-একটা গল্প লেখক সুন্দর ভাবে জুড়ে দেন তার সঙ্গে, এমন ভাবে যাতে মূল গল্পের সঙ্গে বেশ মসৃণভাবে মিশে যেতে পারে। কেন তিনি এমন করেন? উপন্যাসটা একটু মোটাসোটা করবার জন্য? পাঠকের কৌতূহল আরো বাড়িয়ে তুলবার জন্য?

এমনিতে প্রশ্ন দুটো যতোই শুনতে কেমন মোটা দাগের হোক না কেন, এ কথাগুলোও কিন্তু মিথ্যে নয়। উপন্যাসটাকে বেশ খানিকটা কলেবর তো দিতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস বলে মনে হবে কেন! এখন আমাদের আলোচ্য এই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে প্রশ্নটো জেগেছিল, সেই প্রশ্নের রূপায়ণ কিন্তু তিনি প্রথম দুটি খণ্ডেই, অর্থাৎ পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই করে ফেলেছেন—অর্থাৎ লোকালয়বর্জিত স্থানে একটি মেয়ের বেড়ে ওঠা দেখালেন, অবস্থা বিপাকে তাকে বিবাহ করে সভ্যসমাজে নিয়ে আসা দেখালেন, দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে সে মেয়ের কোন পরিবর্তন হল কিনা তাও তিনি দেখিয়ে ফেললেন। সব কিন্তু ওই পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই, যে উপন্যাসের বর্তমান কলেবর হচ্ছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ। তাও প্রথম পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে মতিবিবি। কাজেই মতিবিবিকে বাদ দিলে, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে তো মতিবিবির কোন প্রসঙ্গই ছিল না, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস কেন খণ্ডোপন্যাসের আয়তনও পেত কি না সন্দেহ।

দ্বিতীয় কথাটা ছিল পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলা। তার জন্যেও তো নিশ্চয়ই গৌণ কিছু গল্প মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেবার দরকার হতেই পারে। 'কপালকুণ্ডলা'র গল্পটাই যখন সদ্য আমরা জেনেছি তখন তার কথাটাই আর একবার ভাবা যাক। একেবারে প্রথম দিকটা পাঠকের খুবই কৌতূহল ছিল, একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাও ছিল—কাপালিকের হাতে ধরা পড়ার পর নবকুমার উদ্ধার পায় কি না। যখন কপালকুণ্ডলাই তাকে বাঁচিয়ে দিল, অধিকারী তার সঙ্গে নবকুমারের বিয়ে দিয়ে তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তখন আমাদের কৌতূহলের বিষয় এইবার কপালকুণ্ডলা বা মৃণ্ময়ী একটি সাধারণ নারীর অনুভূতিগুলি লাভ করবে, নাকি আগেকার মত বন্যস্বভাবেরই থাকবে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেখা গেল নবকুমার কপালকুণ্ডলার জন্য পাগল হলেও কপালকুণ্ডলার মনে নবকুমার বা এই সংসারের জন্য কোনরকম আকর্ষণ তৈরি হয়নি—এমনকী সাধারণ নাগরিক মেয়ের মত চুলবাঁধা বা সাজসজ্জার ব্যাপারেও তাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। পাঠকের কৌতূহলকে এবার কী দিয়ে জাগ্রত করবেন বঙ্কিমচন্দ্র। অপ্রধান গল্প তো তাকে খুঁজতেই হবে। এই ধরনের অপ্রধান গল্পগুলিকে উপন্যাস সমালোচনার ভাষায় বলা হয় উপকাহিনী বা subplot. একটা উপন্যাসে এর দরকার হয় আরো নানা রকম কারণে। সেগুলি এবার জেনে নিন।

৩৭.৪.১ উপকাহিনীর অন্যান্য উপযোগিতা

যেকোন উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের যে একটা নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকে, সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিজের বিশিষ্ট মানসিকতার জন্যই এই জীবনদৃষ্টি তৈরি হয়। উপন্যাস যদি এই জীবনদৃষ্টি বা লেখকের নিজস্ব কোন বক্তব্য আমরা খুঁজে না পাই তাহলে উপন্যাসটিকে সার্থক উপন্যাস হিসাবে মেনে নিতে পারবো না। এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা বা বক্তব্য, সেটা তো ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের মূল কাহিনী দিয়েই প্রকাশ করবেন। কিন্তু এখন মনে হতে পারে যে সেই বক্তব্যকে আরো জোরদার করার জন্য তাঁর মনে হল, আরো দুটো একটা উপকাহিনী হলে বেশ সুবিধে হয়। তখন তিনি এই রকম গৌণ কাহিনীর কথা ভাবেন। ব্যাপারটা আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারবেন আর একটু বুঝিয়ে বললে।

প্রথম যে দুটি কারণের কথা বলেছি, উকাহিনী সে জন্য তো দরকার হয় নিশ্চয়ই—উপন্যাসের আয়তন বাড়াবার জন্য উপকাহিনীর খোঁজ করেন লেখক, পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখার জন্যও একসঙ্গে দু-তিনটি

ছোটবড় কাহিনী পেয়ে গেলে একবার এটা, একবার ওটা করে পাঠককে অনেক(ণ ধরে রাখা যায়, কিন্তু ওই জীবনদৃষ্টির ব্যাপারটা আরো গু(ত্বপূর্ণ। সেটার ব্যাপারে উপকাহিনীকে দুভাবে কাজে লাগান হয়। প্রথমত ধ(ণ যে বিশেষ বক্ত(ব্য ঔপন্যাসিক সেই উপন্যাসে প্রকাশ করতে চান ঠিক সেইরকম বক্ত(ব্য নিয়েই যদি একটি ছোট কাহিনী পাশাপাশি বুনে যান, তাহলে তাঁর বক্ত(ব্য আরো জোরদার হতে পারে। দ্বিতীয় ব্যাপারটাও বেশ আকর্ষণীয়। মূল কাহিনীতে যেরকম জীবনচিত্র আছে ঠিক তার বিপরীত ধরনের একটা জীবনচিত্র যদি তিনি উপকাহিনীতে আঁকেন তাহলে প্রে(িতের একটা বৈপরীত্য থাকে বলেই ঔপন্যাসকের বক্ত(ব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কালো কাপড়ের ওপরে যেমন ফুটে ওঠে সাদা সুতোর কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃ(' উপন্যাসটা আপনাদের অনেকেরই চেনা, সেই জন্য ওই উপন্যাসকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে বেছে নিচ্ছি। উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ পরম সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখী থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পেরে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। এর ফল অবশ্য হল বিষময়, কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করল, এই হচ্ছে উপন্যাসের মূল কাহিনী। এর সঙ্গে উপকাহিনী আছে দুটি—দেবেন্দ্রনাথ হীরার আখ্যান এবং শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির আখ্যান। প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারলে তার বিষময় ফলে সংসারে বিপর্যয় দেখা যায়, এই মূল বক্ত(ব্যের সমান্তরাল উপকাহিনী দেবেন্দ্র-হীরার আখ্যান—সেখানেও অসংযমী দেবেন্দ্র দুরারোগ্য পীড়ায় আক্র(ান্ত হয়েছিল এবং হীরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় রকমের যে ব্যাপারটা উপকাহিনীতে হয়ে থাকে, আমরা বলেছি, তার দৃষ্টান্ত শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি বৃত্তান্ত। নগেন্দ্রের অশান্তির সংসার আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য তাঁর বোন কলমমণির দাম্পত্যচিত্র এত মধুর করে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এমনকী, সংসারে প্রকৃত টান যে তৈরি হয় সন্তানকে দিয়ে এবং সেইখানেই যে নগেন্দ্রের জীবনে একটা মস্ত ফাক রয়ে গিয়েছে তা বোঝান হয়েছে কলমমণির সন্তান সতীশচন্দ্রের অত্যধিক পাকামি দিয়ে।

৩৭.৪.২ 'কপালকুণ্ডলার'র উপকাহিনী

উপকাহিনী লিখবার প্রথম যে কারণদুটি থকে, 'কপালকুণ্ডলা'র (ে ত্রে সে কারণদুটি যে ছিলই, সে কথা আপনারা আগেই শুনেছেন, কারণ 'উপকাহিনীর দরকার হয় কেন' শিরোনামে সে আলোচনা আমরা করেছি। 'উপন্যাসের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে প্রাথমিকভাবে কিছুটা কলেবর বৃদ্ধির জন্যই উপকাহিনী লিখবর কথা ভাবতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত নবকুমারের প্রথমা পত্নী মতিবিবিকে নিয়ে আসায় পাঠকের কৌতূহলও যে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, সে কথা অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই। এবার আমাদের দেখতে হবে উপকাহিনী সৃষ্টির অন্য দুটি তাৎপর্য এখানে ফুটিয়ে তুলবার কোন চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল কিনা।

প্রথমেই অবশ্য আপনাদের জেনে রাখা ভাল যে, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবির গল্পটা প্রধান উপকাহিনী হলেও এখানে ছোটো আর একটি উপকাহিনী কিন্তু ছিল, সেটা শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই গল্পটা যে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শোনাবেন, সে কথা নবকুমার পরিবারের পরিচয় দেবার সময়ই বঙ্কিম বলেছেন। জায়গাটা আপনাদের একবার পড়ে শুনিয়ে দিতে পারি ঃ

'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা(তাহার

সহিত পাঠকমহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয় শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা(কেননা, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।'

এবার ভাবুন উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব যে জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে সেটার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ধারণা, সমাজ-সংসারের বাইরে কোন মেয়ে যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বড় হয়ে ওঠে, তাহলে যৌবনকালে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলেও দাম্পত্যজীবনে সে সুখী হতে পারবেনা। এই ধারণা তাঁর ছিল বলেই নবকুমারের প্রগাঢ় প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল—নবকুমারের প্রেম বা দাম্পত্যবন্ধন, কোনটাই তাকে আকর্ষণ করতে পারল না।

উপকাহিনীর কাজ হতে পারে এর অসম্ভব ধারার কোন কাহিনী সৃষ্টি করা। সেটা যে সম্ভব ছিল না, সে কথা আমরা বুঝতে পারি, কারণ এই কাহিনী এতই বিচিত্র ধরণের যে একই গ্রন্থে এরকম আর একটি উপকাহিনী আমাদের কাছে বি(াসযোগ্য হতো না নিশ্চয়ই। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র উপকাহিনীর অন্য তাৎপর্যটির কথা মনে রেখেছেন, অর্থাৎ বিপরীত ধরনের কাহিনী শুনিয়ে একটা বৈপরীত্য তৈরি করা, যাতে সেই প্রে(িতে মূল কাহিনী বেশ ফুটে ওঠে। ছোটো এবং বড়ো দুটি উপকাহিনীর কথাই মনে ক(ন, ব্যাপারটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে শ্যামাসুন্দরীর গল্পে দেখুন, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রীর মধ্যে সে এক জন বলে তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা বিশেষ নেই। স্বামীর মন যাতে পাওয়া যায় সেজন্য প্রসাধনকলা, গুণপনার পরিচয় দেওয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে সে যথেষ্টই করেছে নিশ্চয়ই, তারপরও যখন স্বামীর মন পাওয়া যায়নি তখন টোটকার সাহায্য নিয়েচে। কপালকুণ্ডলাকে বন থেকে ওষধি লতা খুঁজে আনতে বলেছে। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর মন পাবার এই তীব্র চেষ্টা, দাম্পত্যজীবনের প্রতি এই ভালবাসা কপালকুণ্ডলার উদাসীনতা এবং সংসারের প্রতি বিরাগকেই আরো স্পষ্ট করে নাকি।

দ্বিতীয় গল্পে দেখুন এই বৈপরীত্য আরো তীব্র। কপালকুণ্ডলা স্বামীর প্রেম পেয়েও তার মূল্য বুঝতে পারছে না, অথচ মতিবিবি জীবনে প্রচুর বৈভব, প্রচুর আভিজাত্য এবং বিলাস পেয়েও স্বামীপ্রেমের জন্য লালায়িত। সেলিমের মোহ ত্যাগ করে সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে সে, কপালকুণ্ডলার বি(দ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, কাপালিকের কাজে সাহায্য করেছে। কেন? উত্তর কিন্তু একটাই—নবকুমার তার স্বামী, সেই অধিকার সে আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, আবার দাম্পত্যজীবনে সে ফিরে আসবে। মতিবিবির এই তীব্র জীবন পিপাসার প্রে(িত কপালকুণ্ডলার সংসারজীবনে বিতৃষ(াকেই আরো স্পষ্ট করেছে। উপকাহিনী দুটি এই জন্যই সার্থক।

৩৭.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

কপালকুণ্ডলার কাহিনী সংত্র(ান্ত যেটুকু এত(ণ আলোচনা করা হল সেটা সং(পে একটু মনে করার চেষ্টা ক(ন।

প্রথমে কাহিনীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন, মেদিনীপুরে গিয়ে একটি কাপালিককে দেখেই হোক বা যে কারণেই হোক, একটা প্র(বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জেগেছিল, কোন মেয়ে যদি জ্ঞান থেকেই সমাজ সংসারের বাইরে থাকে, তারপর যৌবনকালে তাকে কেউ সংসারী করার চেষ্টা করে, সংসারের প্রতি আগ্রহ কি তার জন্মাবে! সকলের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়েই বোধ হয় উপন্যাসটি তিনি লেখেন। এর কাহিনীতে আমরা দেখি মৃণ্ময়ী প্রায় আজন্ম কাপালিকের কাছে নির্জন বালিয়াড়িতে বড়ো হয়েছে। পরে

নবকুমারকে বিবাহ কর সংসারী হবার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

এই মূল কাহিনী সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরো দুটি খণ্ডকাহিনী জুড়েছেন, উপন্যাসের আলোচনায় যাদের বলে উপকাহিনী। উপন্যাসে উপকাহিনী দরকার হয় মূলত চারটি কারণে—উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করবার জন্য, পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখবার জন্য, লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির অনুরূপ একটি খণ্ডকাহিনী দিয়ে তার তীব্রতা বাড়াবার জন্য অথবা বিপরীত ধরনের উপকাহিনী তৈরি করে মূল কাহিনীর ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্য। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দুটি উপকাহিনী আছে, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী মতিবিবির গল্প এবং নবকুমারের বোন শ্যামসুন্দরীর গল্প। এই উপকাহিনী দুটি উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্য জীবনের তৃষ্ণায় কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

৩৭.৫ ‘কপালকুণ্ডলা’র বৃত্তগঠন

বৃত্তগঠন কথাটা ইংরেজি Plot-construction কথাটির বাংলা রূপান্তর। উপন্যাসের story বা কাহিনী আর plot বা বৃত্ত ব্যাপার দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে। এই তফাতটা ই. এম. ফরস্টার নামে এক ইংরেজ ঔপন্যাসিক সমালোচক ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন Aspects of the Novel নামে একটি ছোটো বইয়ে। এইরকম একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিয়েই পার্থক্যটা বুঝিয়েছেন, বলেছেন—‘রাজা মারা গেলেন, তারপর রাণি মারা গেলেন, এই হল কাহিনী, এবং ‘রাজা মারা গেলেন, তারপর দুঃখে রাণিও মারা গেলেন’, এই হল বৃত্ত। মানেটা কী হল? গল্পে আছে কেবল এই প্রশ্ন, তারপর কী হল! বৃত্তে আছে একটা কার্যকারণ শৃঙ্খল। ব্যাপারটা আপনাদের আর একটু স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করি।

যেকোন একটা ছোট গল্প বা উপন্যাস লিখতে গেলে তার গল্পটা তো লেখককে মোটামুটি ভাবে আগেই ভেবে নিতে হবে, কিন্তু সেটা ঠিক কীভাবে সাজিয়ে লিখলে পাঠকের কৌতূহল বজায় থাকবে, কার্যকারণ শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে, গোটা কাহিনীটার মধ্যে একটা বাঁধুনি থাকবে—এক কথায় তার বিন্যাসটাকেই বলে বৃত্ত। আপনারা যে আগে উপকাহিনীর কথা জেনেছেন, সেও কিন্তু এই বিন্যাসেরই ব্যাপার। কীভাবে আমি আমার গল্পটাকে বিন্যস্ত করবো, এটা ভাবতে গিয়েই ঠিক করতে হয় এতে একটাই কাহিনী থাকবে নাকি একের বেশি। একটিই কাহিনী থাকলে সে বৃত্তকে আমরা বলি সরল বৃত্ত। যদি একাধিক উপকাহিনী থাকে, মানে আমাদের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মত, তবে সেই গঠনকে বলি জটিল বৃত্ত। আর যদি বেশ কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে কোনটিকেই ঠিক প্রধান মনে না হয়, সবগুলোই প্রথমটা দেখতে আলাদা বলে মনে হয়, তবে সেই গঠনটাকে বলি যৌগিক বৃত্ত, যেমন শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’। কপালকুণ্ডলার গঠনটা যে জটিল বৃত্তের, সেটা আমরা এর মধ্যেই জেনে ফেলেছি, কারণ এখানে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের গল্পটাই প্রধান, মতিবিবি আর শ্যামাসুন্দরীর গল্প এই প্রধান কাহিনীটাকে নিটোল হতে সাহায্য করেছে মাত্র। এবার দেখি, গোটা কাহিনীটার বিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কেমনভাবে করেছেন।

আকারে কপালকুণ্ডলা খুব বড় না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে বিন্যস্ত করেছেন চার খণ্ডে। প্রত্যেক খণ্ডে অবশ্য বেশ কিছু করে পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদে আছে—কাপালিকের আস্তানায় নবকুমারের গিয়ে পড়া, বন্দী হওয়া, কপালকুণ্ডলার সাহায্যে সাময়িক মুক্তি, অধিকারীর পৌরোহিত্যে তাদের বিবাহ এবং মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের নির্বিঘ্নে এগিয়ে দিয়ে আসা। দ্বিতীয় খণ্ডের ছ-টি পরিচ্ছেদে পাই—

সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন, পথে নবকুমারের প্রথমা পত্নীর সঙ্গে দেখা এবং বিনা বাধায় কপালকুণ্ডলা নবকুমারের স্ত্রী হিসাবে গৃহীত। তৃতীয় খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদেই পাই—মতিবিবির সংবাদ—আগ্রায় তার প্রতিপত্তির ইতিহাস এবং সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন। চতুর্থ খণ্ডের ন'টি পরিচ্ছেদে নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ, কপালকুণ্ডলার বি(দ্ধে চূড়ান্তষড়যন্ত্র এবং পরিণতিতে দুজনের মৃত্যুর আশঙ্কা। ঠিক মতো কার্যকারণে শৃঙ্খলে সমস্ত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে কিনা বুঝতে গেলে অবশ্য আর একটু বিস্তারিত ভাবে গোটা ব্যাপারটা আমাদের জানতে হবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে নবকুমারের নির্বাসনের কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। দিগভ্রান্ত যাত্রীনৌকা কোনত্র(মে চড়ায় বেঁধে রান্নার উদ্যোগ করলে তা নষ্ট হতে বসেছিল চেলাকাঠের অভাবে। অন্য কেউ রাজি না হওয়ার নবকুমার একাই গিয়েছিল কাঠ কাটতে, ফলে জোয়ার আসবার সময় নবকুমারের প্রতী(া আর কেউ করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আমাদের একটা উপদেশ দিয়েছিলেন সেটিও আপনাদের মনে রাখতে হবে ঃ

'ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। . . . তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তর না হইব কেন?

একেবারে পরের পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সঙ্গে সা(াৎ হয়ে গেলে গল্পের কোন চমক থাকে না, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিঃসঙ্গ ও অসহায় নবকুমারের এমন কষ্ট দেখান হয়েছে যাতে যে কোন কারও সন্ধান পেলে সে বেঁচে যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সন্ধান পেয়েছে এবং তাতে সে আশঙ্কিত না হয়ে খুশিই হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে—পথভোলা পথিককে সে কাপালিকের আশ্রয়ে যেমন পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমারকে বলিদানের জন্য কাপালিক বন্ধন করলে বাঁধনও কেটে দিয়েছে সে। সপ্তম পরিচ্ছেদে খুব যুক্তি(সংগত ভাবেই কাপালিককে উঁচু বালিয়াড়ি থেকে পড়ে যেতে দেখিয়েছেন লেখক, যাতে কিছুদিনের জন্য সে কর্ম(য় না থাকে, কারণ অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী নবকুমারকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন এবং নবম পরিচ্ছেদে বিবাহের পর তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন—গোটা ব্যাপারটাই সময় সাপে(। যেহেতু দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবিকে দেখানো হবে, প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদেই তার উল্লেখ করা হয়েছে।

নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির সা(াৎ করানো হবে বলেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার পালকির সঙ্গে না গিয়ে নবকুমারকে পদব্রজে যাত্রা করানো হয়েছে, মতিবিবি দস্যুর হাতে নিগৃহীতা হয়েছে এবং নবকুমারের সাহায্যে সরাইখানায় পৌঁচেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি তার স্বামীকে চিনেছে, নবকুমার তাকে চেনেনি। সপত্নীকে দেখার প্রলোভন অবশ্যই এবার জাগবে, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলাকে দেখেছে মতিবিবি, তাকে গহনা দান করে নিজের বৈভব বোঝাতে চেয়েছে। পরের পরিচ্ছেদেই সেগুলি ভিখারীকে দান করে কপালকুণ্ডলা তার নিজের চরিত্রও বুঝিয়ে দিয়েছে। যুক্তি(অনুসারে এরপর থাকা উচিত একটি অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে নবকুমারের পরিবার কীভাবে গ্রহণ করে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সেটাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন কপালকুণ্ডলার প্রেমে নবকুমার বিহ্বল হলেও কপালকুণ্ডলার কোনরকম পরিবর্তন নেই।

যে কোনো অল্প শক্তি(মান লেখক হলে কাহিনী হয় এখানেই শেষ হতো, অথবা কপালকুণ্ডলা যে কিছুতেই সংসারে মন বসাতে পারছেনা, বার বার তার বর্ণনা দিয়ে আমাদের বিরক্ত(করা হতো। এই একঘেয়েমি এড়াবার জন্য, অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে সংসারে মন বসাবার জন্য বেশ কিছুটা সময় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গোটা

দ্বিতীয়খণ্ডই প্রায় অতিবাহিত করেছেন নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী ও আগ্রার সম্রাট পরিবার নিয়ে। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন সম্রাট সেলিমের অত্যন্ত কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে উড়িষ্যা পালাতে হয়েছিল, যাতে মেদিনীপুরে নবকুমারের সঙ্গে তার সা(াৎ হয়ে যায়। সেই পূর্বসূত্র অর্থাৎ (মতা দখলের লড়াই দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। আগ্রার সিংহাসনে মতিবিবির টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে সে গিয়েছে শের আফগানের বেগম মেহেরউন্নিসার কাছে। নিজের অস্তিত্বর(া প্রায় অসম্ভব, সে বুঝে গিয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে সম্রাট সেলিমের সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং পঞ্চম পরিচ্ছেদে অনিবার্য ভাবেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আগ্রা ত্যাগের। এইবার আশাহত, (মতাচ্যুত, ভাগ্যের লড়াইয়ে পরাজিত মতিবিবির মনে ঝলসে উঠবে প্রতিহিংসার আগুন, এটাই স্বাভাবিক—তার অধিকারে যে হস্ত(েপ করেছে, তার স্বামীকে যে পরিত্বে বরণ করেছে, তাকে সরতে হবে সেখান থেকে, অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে মতিবিবির। সুতরাং পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে মতিবিবি ফিরে এসেছে পদ্মবতী হয়ে, গাঁটছড়া বেঁধেছে কাপালিকের সঙ্গে, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে।

নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত, চতুর্থখণ্ডে সেই কাজটিই তিনি করেছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্র অপরিবর্তিত, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর বনে সে ওষধি খুঁজতে গিয়েছে। এ কাজ তাকে দ্বিতীয়বার করতে হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, তখনই কাপালিককে জঙ্গলে সে দেখতে পেয়েছে, ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতী এবং কাপালিকের পরামর্শও সে শুনতে পেয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার নিয়তি যেন সে দেখতে পেয়েছে স্বপ্নে, সুতরাং আর একবার সা(াৎ করার জন্য পদ্মবতীর পত্র পেয়ে সে জঙ্গলে যাবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাটকীয়তার চূড়ান্ত পর্যায় পত্র হারানো ও নবকুমারের তা হস্তগত হওয়া। এবার (িপ্ত নবকুমার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাপালিককে তার বাড়িতে ডেকে আনতেও দ্বিধা বোধ করে না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং মদ্যপান করিয়ে কাপালিক নবকুমারকে এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে যে সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার অঙ্গুরীয় বিনিময় দেখতে পেয়ে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দ্বিচারিণী ভাবে। অষ্টম পরিচ্ছেদে নবকুমারই কপালকুণ্ডলাকে ধরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, অদৃষ্টের পরিহাস বোধ হয় একেই বলে। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকুমারের পরিচয় কপালকুণ্ডলার মুখে শুনে তার ঘোর কাটে। কিন্তু নদীর পাড় ভেঙে কপালকুণ্ডলা জলে পড়ে যায়, উদ্ধার করার জন্য নবকুমারও ঝাঁপ দেয়। কেউই আর উঠতে পারে না।

প্রান্তলিপি

'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তার সার কথাটি আপনারা জেনে রাখতে পারেন। তিনি বলেছেন 'যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।'

কাহিনীর এই বিনাস থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী নিপুণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাগুলি সজ্জিত করেছেন, সর্বত্র একটা যুক্তি(শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন এবং নিতান্ত প্রয়োজনেই মতিবিবির উপকাহিনী সৃষ্টি করেছেন।

৩৭.৬ 'কপালকুণ্ডলা'র অতিপ্রাকৃত উপাদান

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা হয়েছে, এবং উপন্যাসের প্রধান ল(ণই যখন বাস্তবতা, তখন বাস্তব উপাদান বা প্রকৃত উপাদানই তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস পড়ে থাকেন, তবে একথা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল যেমন স্বপ্নদর্শন, অলৌকিক ঘটনা, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অবশ্য মনে করতেন পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য বা বাইরের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবার জন্যই এসব ঘটনা উপন্যাসে এসে পড়েছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে ভবিষ্যৎ এবং পরিণতি নির্দেশের কাজেও এইসব ঘটনা অনেক সময়ই কাজে লেগেছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এইরকম দৈব বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছে মূলত দুবার—একবার প্রথম অঙ্কের নবম পরিচ্ছেদে, অন্যবার চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এর কাহিনী আপনারা জানেন, কাজেই ঘটনাদুটির উল্লেখ করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

নবকুমারকে উদ্ধার করে প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে যখন কপালকুণ্ডলা অধিকারীর কাছে এসেছিল তখন অধিকারী তার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ দেবার সংকল্প করে 'একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।' বিল্বপত্রটি পড়ে নি বলেই তিনি মনে করেছিলেন—এই সংকল্পে দেবী কালিকার সম্মতি আছে। কিন্তু বিবাহের পর যাত্রাকালে যখন দেবীর কাছে আবার এসেছেন—'ভক্তি(ভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরী(ণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।'

এই ঘটনা কপালকুণ্ডলার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, এমন হতে পারে, কারণ সংস্কার এবং তামসিক ভক্তি(তার মনে অত্যন্ত বেশি থাকারই কথা।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা একটি স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এখানেও যেন তার ভবিষ্যতের একটি নির্দেশ আমরা পাই। কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখেছে—একটি তরীতে বসন্তলীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হঠাৎ দুর্যোগের কালো মেঘে সব পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠল সমুদ্রে। 'একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পু(ষ' এসে তরী বাঁ হাতে তুলে ধরল। 'ভীমকান্তশ্রীময়ী ব্রাহ্মণবেশধারী' অন্য একজন তরী ধরে জানতে চাইলেন—তরী ভাসাবেন না নিমগ্ন করবেন। ''কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, 'নিমগ্ন কর।'' তরী পাতালে নিমজ্জিত হল।

এই স্বপ্নের অবশ্য একটা সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা পাই। কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন নষ্ট করার জন্যই যে কাপালিক এসেছে, তা কপালকুণ্ডলা দেখেছে। ব্রাহ্মণবেশধারী যে পু(ষ নয়, তা সে শুনেছে, কিন্তু কাপালিকের সঙ্গে তাকে মন্ত্রণা করতে যখন সে দেখেছে তখন তার সর্বনাশের জন্যই জল্পনা-কল্পনা চলেছে, এ কথা চিন্তা করা তার প(অসম্ভব নয়। স্বপ্নটি হয়তো তার সেই চিন্তারই ফলমাত্র।

৩৭.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

আমাদের এত(ণকার আলোচনায় এ কথা নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, কপালকুণ্ডলায় লেখক এমন

'একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, ঠিক যেরকম পরিবেশ আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আমরা পাই না। এটা ঠিক আমাদের চেনা মানুষের গল্পও নয়—কাপালিক আর কপালকুণ্ডলার সা(াৎ আমরা কেউই প্রায় পাবো না। যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তাও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, কারণ ওইভাবে একটি নির্জন বালিয়াড়িতে নির্বাসিত হবো এবং একটি সুন্দরী যুবতী কাছে এসে বলবে 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এমন অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই হয়তো হবে না।

> **প্রান্তলিপি**
>
> এখানে একবার মনে করে নিতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-র আরম্ভটা ঃ '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পু(ষ বিষ্ণু(পুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।'

ব্যাপারটা যতই কাল্পনিক হোক, এই কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে তাকে বাস্তব করে তুলতে হবে, অর্থাৎ পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। সেই ব্যাপারটা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী কী চেষ্টা করেছেন,—সেগুলোই আমরা এবার ল(করার চেষ্টা করবো।

৩৭.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

যে গল্প শোনানো হচ্ছে, সেটা আরম্ভ করবার সময়টা একেবারে নির্দিস্ট করে বললে কী হয়, মনে হয় যেন এটা গল্প নয়,—সত্য ঘটনা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস শু(করেছেন এইভাবে ঃ

'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।' অর্থাৎ তখন সালটা যে প্রায় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ—কারণ এই উপন্যাস লেখা হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, এটা স্পষ্ট করে বলা হল। তাতে মনে হল, যেন এটা কোন কাল্পনিক কাহিনী নয়। অবশ্য এটা বঙ্কিমচন্দ্রের অতি প্রিয় কৌশল, অন্যান্য উপন্যাসেও এরকম কৌশল আপনি পাবেন।

কিন্তু এই কৌশলের কথা মুখে বলা যত সহজ, সর্বদা স্মরণ রেখে ঠিক সেইমত উপন্যাস লিখে যাওয়া কিন্তু অতো সহজ নয়। যেমন দেখুন, সপ্তদশ শতকের ঘটনাক্র(ম বললেই মনে রাখতে হবে, ইংরেজ তখনও এদেশে আসেনি। সেটা মাথায় রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল।'

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র যখন মতিবিবির প্রসঙ্গে আগ্রার মোগল রাজবংশের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনও স্মরণ রেখেছেন, সেটা সম্রাট আকবরের মৃত্যু ও যুবরাজ সেলিমের সিংহাসন লাভের সময়।

তৃতীয় আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায়। সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাসভবনের কাছাকাছি এমন অরণ্য থাকতে হবে যেখানে কাপালিক লুগিয়ে থাকতে পারে, যেখানে ওষধির সন্ধানে কপালকুণ্ডলা পরিভ্রমণ করতে পারে। এই কারণেই সমৃদ্ধিশালী নগর হিসাবে পরিচিত সপ্তগ্রামের সে সময় কীরকম অবস্থা ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন একটু বিশেষভাবে ঃ

'সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওপনিবেশিক ভাগে নবকুমারের বাস। . . . নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রো(শার্ধ দূরে একটি (ুদ্র খাল বহিত(সেই খাল একটা (ুদ্র প্রান্তর

বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাস্তবতা র(ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সতর্কতা এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোধ হয় সৃষ্ট হতে পারবে।

৩৭.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনী

একটি কাল্পনিক কাহিনী পরিবেষণ করতে গিয়ে উপকাহিনীতে অর্থাৎ নবকুমারের প্রথমা পত্নীর গল্প-প্রসঙ্গে ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আশ্রয় করলেন, এ বিষয়ে নানা কারণ অনুমান করা যায়। কেউ কেউ এরকম বলেন যে—'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবেশে এবং ঐতিহাসিক চরিত্র সমন্বয়ে রচনা করে তিনি বিশেষ সাফল্য ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, সেই জন্যই দ্বিতীয় উপন্যাসে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি, ইতিহাসের কাহিনী যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেটুকুই বর্ণনা করেছেন।

আমার কিন্তু সে কথা মনে হয় না। এ বিষয়ে আমার মত হল এই যে, বাস্তবতা র(ার জন্যই এ কাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে করতে হয়েছে। এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবেই আমার। আপনারা উপন্যাসটি ভালভাবে পড়ে দেখে যদি এর সঙ্গে একমত না হন তবে অবশ্যই অন্যভাবে আপনার শি(াসহায়কের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি মনে করি যে কাহিনী এই উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু কাল্পনিক নয়, এত বিচিত্র ধরনের যে, কোন মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাকে ধরার সম্ভাবনা খুবই কম। এই রকম একটা পুরোপুরি কাল্পনিক কাহিনীকে বি্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে বি্বাসের একটা ভূমি দরকার, 'ইতিহাস সেই বি্বাসের ভূমি বলে আমি মনে করি। রসুলপুরের নদীর চরে কাপালিকের বসবাস বা প্রায় আজন্ম কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করবার ব্যাপারটা একেবারে অলীক হতে পারে, কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনলাভ তো অলীক নয়, মানসিংহের ভগিনী যে তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন, এ খবর তো অসত্য নয়, এবং জাহাঙ্গীর যে শের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসার প্রতি গাঢ় প্রণয়াসক্ত(ছিলেন, ইতিহাসই তার নির্ভুল সা(্য দেয়—অন্যায়ভাবে শের আফগানকে হত্যা পর্যন্ত করাতে হয়েছিল তাঁকে নিজের অভিলাস পূর্ণ করার জন্য। কাজেই এমন একটি শক্ত(জমির ওপর নিজের উপন্যাসকে দাঁড় করাবার যে সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র হাতে পেয়েছেন, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন নবকুমারের প্রথমা পত্নীকে লুৎফ-উন্নিসা হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন করিয়ে। ইতিহাসের এই কাহিনী বি্বাসযোগ্য বলেই লুৎফ-উন্নিসার কাহিনীও বি্বাসযোগ্য এবং লুৎফ-উন্নিসার সূত্রেই নবকুমারের কাহিনীটি পাঠকের বি্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

৩৭.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

চারখণ্ডে সম্পূর্ণ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে পরিচ্ছেদের সংখ্যা একত্রিশ। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মণিমুক্ত(া সংগ্রহ করেছেন। পরিচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে কিছুটা ভাবসাদৃশ্য আছে, বিভিন্ন সাহিত্য থেকে এরকম অংশ খুঁজে খুঁজে এক বা একাধিক পংক্তি(পরিচ্ছেদ শু(র আগে তুলে দিয়েছেন। এতে শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাই নয়—যে সমস্ত নাটক ও কাব্যকে আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তাদের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্যে উপন্যাসটিও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, তার বি্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ধৃতিগুলি আপনাদের কারো কারো কাছে অপরিচিত মনে হতেও পারে। কিন্তু এগুলি না জানা থাকলে

উপন্যাসটির রস পুরোপুরি গ্রহণ করা যাবে না, তাই আমি অতি সং(পে এদের পরিচয় দেবো।

প্রথম খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ — 'Floating straight obedient to the stream.' বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের Comedy of Errors নাটকের একটি পংক্তি(। এই নাটক অবলম্বনেই বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'। নবকুমারের যাত্রীবাহী নৌকা যেমন এখানে ঘন কুয়াশার মধ্যে পড়ে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, শেক্সপীয়রের নাটকেও তেমনি বণিক Aegion (ইজিয়ন) দিগন্তজোড়া কুয়াশার মধ্যে পড়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — 'Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!' - শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক King Lear-এর প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। বড়ো এবং মেজো মেয়েকে সম্রাট লিয়র অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই পাননি বলে এটি তাঁর খেদোক্তি(—অকৃতজ্ঞতাই সবচেয়ে কঠিন হৃদয় শত্রু। কপালকুণ্ডলার এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও এইরকম অকৃতজ্ঞতাই পেয়েছিল সহযাত্রীদের কাছে। তাদের আহার হবে না বলে গিয়েছিল কাঠের জোগাড় করতে, তারাই তাকে চরে নির্বাসন দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— '—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And girmly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes.'

বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' (Don Juan) কাব্যগ্রন্থ থেকে পংক্তি(গুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই কাব্যের নায়ক জাহাজে করে সমুদ্রপথে যখন চলেছিল, তখন রাত্রির গভীর অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এরকম অনুভূতিই তার হয়েছিল, যেন যবনিকা উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে এসেছে নিকষ কালো রাত সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ ও দৃষ্টি হতাশ করে দিতে। ডন জুয়ানের সঙ্গে অবশ্য একজন সঙ্গিনী ছিল, কপালকুণ্ডলার এই পরিচ্ছেদে অজানা নির্জন দ্বীপের কালো অন্ধকারে নবকুমার একা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের পঞ্চম সর্গে এই পংক্তি(দুটি আছে। লঙ্কার উত্তর দরজায় গভীর বনের মধ্যে অবস্থিত চণ্ডীদেবীর মন্দিরে লক্ষ্মণ এসেছিলেন দেবীকে পুজো করতে, উদ্দেশ্য মেঘনাদকে বধ করা। সেই সময়ই দরজায় ভীষণদর্শন মহাদেবকে দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। নবকুমার এই পরিচ্ছেদে কাপালিককে ওইভাবে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বোধ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— '—যোগপ্রভাবো ন চ ল(্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।।'

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য ‘রঘুবংশম্’-এর যোড়শ সর্গে এই ![](-একটি আছে। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর শারাবতীতে যখন কুশ রাজত্ব করছেন, গভীর রাতে একদিন অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সাধারণ নারী হিসাবে তাঁর বন্ধ ঘরে তাঁকে দর্শন দিলেন। সেই রাজলক্ষ্মীকেই কথাগুলি কুশ বলেছিলেন—আপনার বিশেষ যোগশক্তি(আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ আপনার আকৃতি দুখিনী নারীর মত, আপনাকে হিমক্লান্ত মৃণালিনী বা পদ্মফুলের মত মনে হচ্ছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখে হতবাক হয়ে যাবে বলেই এই পরিচ্ছেদে ‘রঘুবংশের’ কুশের বিমূঢ় অবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—

শ্রীহর্ষ রচিত ‘রত্নাবলী’ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে রাজার এই সংলাপের অংশ সংগ্রহ করা হয়েছে। শৃঙ্খলিতা সাগরিকাকে দেখে রাজা এই কথা বলেছেন—এ কী! তুমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমি দ্রুত এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। কপালকুণ্ডলাও এই পরিচ্ছেদে নবকুমারের বন্ধনমুক্ত(ঘটাবে, সেই জন্যই এই প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— ‘And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak.’

এই অংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি বোঝা যায়। এটি নেওয়া হয়েছে মেকলের Lays of Ancient Rome গ্রন্থ থেকে। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে লুনার অধিপতি ভূপতিত হওয়ার সঙ্গে মেকলে তুলনা করেছিলেন অ্যালভার্নাস পাহাড়ের একটি বজ্রাহত ওক গাছের লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে। এখানে বালিয়াড়ির শিখর থেকে কাপালিকের পতন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই তুলনার কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— ‘And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua.’

এটি শেক্সপীয়রের ‘রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট’ (Romes and Juliet) নাটকের অংশবিশেষ (4th Act, Scene1)। এখানে নায়িকা জুলিয়েটকে লরেন্স সান্ত্বনা দিয়ে বলছে,—ওষুধের প্রভাবে মৃতপ্রায় জুলিয়েটকে কবরস্থ করার জন্য নিয়ে এলে সেই রাত্রেই রোমিও তাকে মান্টুয়ায় নিয়ে যাবে। মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছে বলেই এই অংশ লেখকের মনে পড়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ— ‘কণ্ব। অলং বুদিতেন(স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।’

মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব এই করেছিলেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় তাকে অঝোরে কাঁদতে দেখে তিনি বলেছিলেন, আর কেঁদো না, স্থির হও। তোমার পথের দিকে চেয়ে দেখো। নবম পরিচ্ছেদে অধিকারীও প্রায় সেই ভূমিকা গ্রহণ করে কপালকুণ্ডলাকে উপদেশ দিয়েছেন বলে সদৃশ অংশ লেখক উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— '—There—now lean on me:
Place your foot here—

ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' (Manfred) নাট্যকাব্যে এই সংলাপটি পাওয়া যায়। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় ম্যানফ্রেডের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলে একজন শিকারী তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এ কথা বলেছিল—আমার দেহের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে আসুন। এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও মতিবিবিকে সেইরকম কথা বলবে বলে লেখক ম্যানফ্রেডের ওই অংশের সঙ্গে নিজের লেখার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের সংস্কৃত 'উদ্ধবদূত' কাব্যে কবি শ্রীরাধাকে দেখে এই মন্তব্য করেন—স্বভাব চঞ্চলা এই নারীটি কে? 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার মতিবিবিকে চিনতে না পেরে কেবল প্রগলভা নারীটির আচরণ দেখে এইরকম কথাই হয়তো মনে করে থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'ধর দেরি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। রতিদেবী এ কথা বলেছেন দেবী পার্বতীকে। রাবণবধের জন্য মহাদেবের অনুগ্রহ দরকার, মহাদেব ধ্যানমগ্ন—সেই ধ্যান ভঙ্গ করতে পারেন একমাত্র পার্বতী, তাই রামচন্দ্রের অনুরোধে রতিদেবী পার্বতীকে মোহিনী সাজে সাজাবার জন্য এ কথা বলেছেন। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবিও কপালকুণ্ডলাকে সাজাবে, কিন্তু তার সঙ্গে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সাদৃশ্য বোধহয় খুব বেশি নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।'

এটিও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এখানেও আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার সব গহনা ভি(ককে দেওয়ার সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের সাদৃশ্য খুব বেশি নেই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে সীতা রাবণ কর্তৃক হরণের সময় রামচন্দ্রকে পথের সন্ধান দেবার জন্য অলংকারগুলি ওইভাবে ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।।'

কবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' পত্রকাব্যের উত্তরমেঘ অংশের ৪২-সংখ্যক (-াকের এটি আরম্ভ। এই (-াকে

নির্বাসিত যক্ষের প্রগাঢ় প্রেম স্পষ্ট হয়েছে। এর বাংলা ভাষান্তর প্রায় এইরকম—তোমার সখীদের কাছেও সে কথা অনায়াসে প্রকাশ্যেই বলা যায়, সেরকম অগোপন কথাও একদিন সে তোমার আনন স্পর্শ করার লোভে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলতো। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই নবকুমারের প্রেমের গাঢ়তা বোঝাতেই এই সদৃশ বর্ণনা খুঁজেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যুরুণায় কল্পতে।।'

কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পঞ্চম সর্গে এই শ্লোকটি আছে। উমার তপস্বিনী মূর্তি দেখে স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মচারী বেশে তাঁকে ছলনা করতে এসে এই কথা বলেছিলেন—যৌবনেই সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে তুমি বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী বল্কল ধারণ করেছো কেন! প্রদোষকালে প্রস্ফুট চন্দ্র ও তারকাশোভিত বিভাবরী কি কখনও অরুণের কাছে যেতে পারে, তুমিই বলো! অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে যোগিনী কপালকুণ্ডলা সঙ্গে সাধিকা উমার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— 'কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবং।'

শ্রীহর্ষরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোকের সামান্য অংশ এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। কথাটা বলেছেন রাজমন্ত্রী যৌগন্ধাবায়ণ। রাজার মঙ্গলের জন্যই অনেক রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে যা রাজার পছন্দ নয়। সেই জন্যই তিনি ভৃত্যের কাজকে বড়ই কষ্টকর বলেছেন। এই পরিচ্ছেদে লুৎফ-উন্নিসাও অনেক রকমের অনভিপ্রেত কাজ করেছে, তবে তা নিজের মঙ্গলের জন্য নয় রাজার মঙ্গলের জন্য, বলা শক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে।।
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফলা হলো, হতে পারে কাল।।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটক থেকে এই অংশটি সংগ্রহ করা হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত এই উক্তিটি করেছেন মন্ত্রী জলধর। স্ত্রীর কাছে একবার অপদস্থ হয়ে আবার তারই সাহায্য প্রার্থনা করবেন সংকল্প করে তাঁর এই উক্তি। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরও হতোদ্যম না হয়ে সে নতুন করে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছে বলেই অংশটি প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথ মমাস্তি।'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'উদ্ধবদূত' কাব্যগ্রন্থ থেকে এই পংক্তি উদ্ধৃত। এই উক্তি শ্রীরাধার—শ্যাম ছাড়া আমার প্রাণনাথ আর কেউ নেই। এই পরিচ্ছেদে সম্ভবত মতিবিবিও বুঝতে পেরেছে, নবকুমারের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন গতি তার নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ‘পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গানা কাব্য’ থেকে সংগৃহীত। এটি ‘শান্তনুর প্রতি জাহ(বী’ পত্রের অন্তর্ভুক্ত(। রাজা শান্তনুকে জাহ(বী বিবাহ করেছিলেন কেবল এই শর্তে যে সন্তানকে তিনি গঙ্গাগর্ভে-বিসর্জন দেবেন, রাজা বাধা দিলেই তিনি স্বর্গে ফিরে যাবেন। যেবার অসহিষ্ণু(হয়ে শান্তনু বাধা দেন সেবারই জাহ(বী সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং রাজাকে এ কথা বলেন। এই পরিচ্ছেদে সেলিমের প্রতি মতিবিবির সম্ভাষণ পড়লেই বোঝা যায়, তার বক্ত(ব্যও এই একই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— ‘জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ ন গলে।।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।।
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।।’

এটি কবি বিদ্যাপতির অতি বিখ্যাত এক বৈষ(ব পদ। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। কৃষ(মথুরায় চলে যাবার পর রাধার বাবসম্মিলনের পদ এবং এখানে আর অংশ নয়, গোটা পদটাই বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দিয়েছেন। কৃষে(র প্রেমে মুগ্ধ রাধা এখানে প্রেমের অসীম রহস্যময়তার অনুভূতিই প্রকাশ করেছেন। এতদিন লীলায় অংশগ্রহণ করেও এ লীলা কত মুর রাধা বুঝতে পারেননি, ল(ল(যুগ কৃষে(র হৃদয়ে হৃদয় যোগ করেও হৃদয় জুড়োয় নি। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মতিবিবি এই প্রথম বুঝতে পারছেন প্রকৃত প্রেমের রহস্য, তাই প্রেমের অসীম রহস্যময় অনুভূতির পদ এখানে সংযোজিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা’ পত্রিকার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত। মধুসূদনের অমর লেখনীতে রা(সীও এখানে প্রেমমুগ্ধা নারীতে পরিণত হয়েছে, বলেছে দেহ মনপ্রাণ সবই সে সমর্পণ করবে লক্ষ্মণকে। শিরোনাম হিসাবে এটা অত্যন্ত উপযোগী বলেই আমাদের মনে হয়, কারণ রা(সীর মতই ইন্দ্রিয় লালসাযুক্ত(জীবনযাপন করে মতিবিবি এখন মধুর দাম্পত্যপ্রেমে আত্মসমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— ‘I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat.’—

বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি ‘ম্যাকবেথ’ —নাটক থেকে অংশটি গৃহীত। এটি প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত(। রাজা ডানকানকে মারার ব্যাপারে প্রথমে ছিল তাঁর তীব্র অনিচ্ছা, এ ব্যাপারে সংকল্প যখন স্থির করেন, তখনই এই উক্তি(তিনি করেন। নবকুমারের কাছে আত্মসমর্পণ যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন মতিবিবি নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য কপালকুণ্ডলার সর্বনাশে উদ্যত হয়েছে—এই ব্যাপারটাই এখানে দেখতে পাবো বলে শীর্ষ উদ্ধৃতি সংগত বলেই আমাদের মনে হয়।

চতুর্থ খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— 'রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র অন্তর্গত 'সারিকা' নামক একটি কবিতা থেকে এই পংক্তি(টি উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রীরাধা পিঞ্জরে আবদ্ধ সারিকাকে দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তিনি যে সমাজ-সংসারের বাধা অতিত্র(ম করে কৃযে(র সঙ্গে মিলিত হতে পারছেন না, তার সঙ্গে সারিকার শুকের সঙ্গে মিলিত না হতে পারার যন্ত্রণাকে এক করে দেখতে পেয়েছেন বলেই তাঁর মিনতি সারিকাকে মুক্তি(দেওয়ার জন্য এবং তার পরেই তাঁর নিজের বেড়ি ভাঙার জন্য। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কপালকুণ্ডলাকে সারিকার সমগোত্রীয় মনে করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— '—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light.'

ইংরেজ কবি Keats-এর বিখ্যাত কবিতা Ode to A Nightingale থেকে এই অংশটুকু এখানে তুলে আনা হয়েছে। কোমল রাত্রি, আকাশের সম্রাজ্ঞী চন্দ্রকলা প্রসন্না, তারাপরীর দল ঝাঁক বেঁধে ভিড় করেছে চারপাশে, অথচ কবির কাছেই কোন আলো নেই। এই অংশের সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য আছে কপালকুণ্ডলার নিশাভিসারের। বাসন্তীরাত্রি জ্যোৎস্নায় প্'াবিত, কিন্তু তার জীবনে তো নেমে আসবেই অসুন্দর অন্ধকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'I had a dream, which was not all a dream'.

লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' — কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে পংক্তি(টি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কাব্যের নায়িকা হেইডি একটা স্বপ্ন দেখেছিল, যা শুধু স্বপ্ন নয়, তার জীবনের পূর্বাভাসও বটে। তাই বলা হয়েছে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের সঙ্গে এর একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে বলেই পংক্তি(টি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে এসেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '— I will have grounds
More relative than this.'

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক 'হ্যামেলেটের (Hamlet) প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে এটি সংগৃহীত। একটি নাটকের অভিনয় করিয়ে হ্যামলেট পিতার হত্যাকারী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই হ্যামলেটের এই উক্তি(। কপালকুণ্ডলাও সমস্ত সংশয়ের অবসানের জন্যই ব্রাহ্মণ কুমারের কাছে গোপনে যাওয়া মনস্থ করেছে। এখানেই দুটি ঘটনার সাদৃশ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list.'

এটিও শেক্সপীয়রের আর একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি থেকে সংগৃহীত, নাম —'ওথেলো' (Othello) এখানে আপাত-ভালমানুষ কিন্তু প্রকৃত শয়তান ইয়াগো ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর সন্দেহকে তীব্রতর করে তুলবার জন্য এরকম করে কথা বলছে। কাপালিকও নবকুমারের মন কপালকুণ্ডলার প্রতি বিষিয়ে দেবার

জন্যই এই পরিচ্ছেদে এই ধরনের আচরণ করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কু(দেবকার্য্যম্।'

মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য'-এর তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীত। এটি দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি(। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য মদন যখন নিজের মনস্থির করতে পেরেছে, তখনই ইন্দ্র মদনকে একথা বলেছিলেন—তবে সিদ্ধিলাভের জন্য যাও, দেবকার্য সুসম্পন্ন কর। এখানে কাপালিকও কপালকুণ্ডলাবধকে দেবকার্য হিসাবেই দেখাতে চেয়েছে এবং নিজ অ(ম বলে এ কাজ করাতে চেয়েছে নবকুমারকে দিয়েই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'Be at peace; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love.'

এই উক্তি(টি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেছেন লর্ড লীটনের 'লুত্রে(শিয়া' (Lucretia) উপন্যাস থেকে। লুত্রে(শিয়া যাকে ভালবাসতো, সে ভালবাসতো লুত্রে(শিয়ার বোন সুসানকে। সুসান এখানে ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার প্রেমিককে অনুরোধ করছে, সে যেন লুত্রে(শিয়াকেই ভালবাসে। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার কথাবার্তার মধ্যেও অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটেছে বলে 'লুত্রে(শিয়া' উপন্যাসের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'No spectre greets me – no vain shadow this.'

এই পংক্তি(টি ইংরেজ-কবি W illiam W ordsworth-এর Laodamia কবিতা থেকে সংগৃহীত। ঈ(রের অনুগ্রহে লাওডেমিয়াও তার মৃত স্বামীর ছায়া দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মনে হয়েছে তা যেন ছায়া নয়, সজীব। এখানেও ভবানীমূর্তি কপালকুণ্ডলার কাছে ছায়ার মত এলেও তা শুধু ছায়া নয়।

নবম পরিচ্ছেদ— 'বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চি(পৈতি মেদিনীম্।।'

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যের অষ্টম সর্গের ৩৮ সংখ্যক (্লোকটি এখানে শীর্ষ নির্দেশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি ছিল এইরকম—নারদের বীণা থেকে মালা খসে অজপত্নী ইন্দুমতীর ওপর পড়লে রানী মারা যান। তা দেখে রাজা অজও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এটাই যে স্বাভাবিক, সেটা বোঝাতে গিয়ে (্লোকে বলা হয়েছে—হৃদয়ে(রীর হতচেতন দেহের সঙ্গে তাঁর পতি অজও ভূতলে পতিত হলেন, কারণ জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে এক বিন্দু তেল (রিত হলে জ্বলন্ত শিখারও কিছু অংশ ভূতলে পতিত হয়। বোঝাই যাচ্ছে, কপালকুণ্ডলার জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে এর স্পষ্ট সাদৃশ্যই এরকম উল্লেখের কারণ।

৩৭.৮ সার-সংক্ষেপ

এই এককে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি, একটি কাল্পনিক কাহিনীকে বাস্তব ও বি(াসযোগ্য করে তুলবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। প্রথমত, তিনি সময়ের উল্লেখ করবার সময় খুব নির্দিষ্ট করে তা নির্দেশ করেছেন যাতে ঘটনাটা ওই বিশেষ সময়েই ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য

সেই সঙ্গে সেই বিশেষ সময়ে কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে যা সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য কী, এটাও মনে রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, মুঘল রাজদরবারের কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্যও ছিল প্রধানত এই বাস্তবতা সৃষ্টি করা। কারণ ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা আমরা সকলেই জানি, কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে তাকে নিখুঁত ভাবে জুড়ে দেওয়া মানেই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার একটা গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের যেমন একটা করে নাম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার ঘটনা নির্দেশ করতে, যথা 'সাগরসঙ্গমে', 'উপকূলে', 'বিজনে', 'স্তূপশিখরে' প্রভৃতি, তেমনি কাহিনী শু(করার আগে বিখ্যাত কোনও নাটক, কাব্য, কবিতা বা উপন্যাস থেকে একটি বিশেষ অংশ উদ্ধারও করেছেন। আমরা প্রত্যেকটি অংশের উৎস নির্দেশ করেছি। আসলে এই সব সাহিত্যিক সৃষ্টি এত বাস্তব হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে যে এগুলির উল্লেখ করলেই বর্তমান কাহিনীর বাস্তবতা যেন তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কাহিনীর বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার জন্য চরিত্রগুলিকেও বাস্তব করে তুলতে হয়। তা বঙ্কিমচন্দ্র করতে পেরেছেন কিনা সেটা আমরা পরের এককে দেখবো।

৩৭.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি

উপন্যাসে লেখক গল্প বলেন, সেই গল্পকে বৃত্তে ভালভাবে বিন্যস্ত করেন, তাকে বি(াসযোগ্য করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—সবই তো আমরা দেখলাম। তাহলে চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে আবার আলাদা করে নজর দিতে হবে কেন, এ প্র(আপনাদের মাথায় জাগতেই পারে। সেই কথাটাই একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

উপন্যাসে লেখক নিজে অবশ্য মন্তব্য করতে পারেন, ঘটনাবর্ণনাও করতে পারেন কিন্তু এটা তো আরো সত্যি কথা যে, চরিত্রগুলোকে ভালবেসে ফেলেন বলেই পাঠক গল্পটা পড়বার আগ্রহ বোধ করেন। যে মানুষগুলি উপন্যাসে আছে, তারা যখন রক্ত(মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে তখনই তো গল্পটাকে আমাদের আর বানানো বলে মনেই হয় না, তারা আমাদের খুব আপনজন হয়ে ওঠে, আমরাও আগ্রহভরে তাদের গল্প শুনি। সুতরাং গল্পের মানুষগুলিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ত(মাংসের মানুষ করে তুলতে হবে এটাও উপন্যাসের একটা শর্ত। সেই ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় কীভাবে করতে পেরেছেন সেটা আমাদের দেখতে হবে।

তবে সেটা শুধুই প্রধান চরিত্রদের দিকে তাকিয়ে করলেই হবে না, খুব অল্প সময়ের জন্য হয়তো একটা চরিত্র দেখা গিয়েছে, সেটির প্রতিও ঔপন্যাসিক দৃষ্টি কেমন, এ থেকে লেখকের সামর্থ্য বোঝা যায়। তাই দুরকম চরিত্রের প্রতিই আমরা নজর রাখবো, অর্থাৎ চরিত্রগুলিকে লেখক কীভাবে প্রাণ দিতে পেরেছেন। প্রথমে প্রধান চরিত্রগুলির কথাই ভেবে দেখা যাক।

১.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

উপন্যাসের নাম থেকেও বোঝা যায়, কাহিনী থেকেও বোঝা যায়, নারীরাই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ, পু(ষেরা নয়। বস্তুত, নবকুমার ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য পু(ষ এই উপন্যাসে আমরা খুঁজেও পাই না। কাপালিক অবশ্য গল্পের পরিণতি ঠিক করার ব্যাপারে অনেকটাই সাহায্য করেছে, যেমন নবকুমারের

দাম্পত্য জীবন গঠনের ব্যাপারে অধিকারীর ভূমিকাও রয়েছে অনেকখানি। কিন্তু গল্পের নায়ক যাদের মনে করা হয়, ঠিক তেমন চরিত্র বলতে আমরা নবকুমারকেই বুঝে থাকি।

নায়কের সাধারণত যেসব গুণ থাকা দরকার, নবকুমারের তার প্রায় সবই আছে। বয়সে যুবক হলেও বিবেচনায় যে সে কারো চেয়ে কম নয়, প্রথম পরিচয়েই সে কতা আমরা বুঝতে পারি। যেমন, ঘোর কুয়াশায় দিগভ্রান্ত হয়ে মাঝি যখন বুঝতেই পারছে না সে কেমন করে এ থেকে উদ্ধার পারে, তখন বৃদ্ধ তাকে তিরস্কার করলে নবকুমার বলেছিল, 'যাহা জগদী(্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে?' এ সংবাদও পরে আমরা জানতে পারি যে সেই বৃদ্ধের বাড়িতে অন্য অভিভাবক কেউ নেই বলে তাঁকে সে এই গঙ্গাসাগর যাত্রায় আসতে নিষেধ করেছিল। পুণ্যের জন্য তীর্থে আসতেই হবে, এ কথাও সে মেনে নেয়নি, বলেছে, 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।'

নবকুমার যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সেই সঙ্গে কাব্যরসিকও, সে কতা আমরা বুঝতে পারি বিস্তীর্ণ সমুদ্রসঙ্গম থেকে দূরের আবছা তটভূমি দেখে নবকুমারের 'রঘুবংশম্' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ (্-াক অর্থাৎ 'দূরাদয়শ্চত্র(নিভস্য তন্বী ......' ইত্যাদি মনে পড়ে যাওয়ায়। যেরকম দুর্বিপাকে পড়ে যাত্রীরা সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থাতেও নবকুমার কাব্যরস আস্বাদন এবং সৌন্দর্য উপভোগের মত অবস্থায় আছে, এটা বড় কম কথা নয়।

নবকুমারের সাহসিকতারও প্রশংসা করতে হবে, কারণ যে অবস্থায় সে যে স্থানে বিসর্জিত হয়েছিল—'গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই(নদীর জল অসহ্য লবণাত্ত((........প্রাণনাশই নিশ্চিত'—তা সত্ত্বেও সে বালিয়াড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোতে পেরেছে। নিদ্রাভঙ্গ হবার পর কাপালিকের মুখোমুখি হবার মত সাহসও তার ছিল।

নবকুমারের পরোপকার ব্রতের কথা আমরা প্রথমেই জানতে পেরেছি। অচেনা চর এবং বালিয়াড়ি বলে রান্নার উপযোগী কাঠ কাটতে যেতে কেউই রাজি হয়নি, নবকুমার রাজি হওয়ার পর শুধু একজনকে সঙ্গী হতে বলেছিল, তাতেও কেউ রাজি হয়নি। অগত্যা সে একাই অগ্রসর হয়েছিল।

কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার মধ্যে একই সঙ্গে নবকুমারের মধ্যে বিবেচনাশক্তি(এবং কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ দেখা যায়। অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহের প্রস্তাব করার পর সারা রাত যে নবকুমারের ঘুম হয়নি, উপন্যাসে তার প্রমাণ আমরা পাই। সকালে নিজের সিদ্ধান্ত সে জানিয়েছে—'আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব।'

অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, নবকুমারের যে একটি বিবাহ আগে ছিল, সে জন্য সে চিন্তিত নয়, তাঁর চিন্তা অন্য। একটি অজ্ঞাতকুলশীল কন্যাকে এভাবে বিবাহ করে নিয়ে গেলে হয়তো তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে, এই ভাবনাই সারা রাত তাকে ঘুমোতে দেয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে সে চিন্তা করে দেখেছেন, যে নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করেছে, তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া তার উচিত হবে না, কারণ ফিরে গেলে কপালকুণ্ডলার যে মৃত্যু সুনিশ্চিত, এ কথা অধিকারী তাকে বলেছিলেন।

সৌন্দর্যপিপাসু নবকুমার যে বিবাহের পর কপালকুণ্ডলাকে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, তা আমরা

দেখেছি। নিজের পরিবার যখন মৃণ্ময়ীকে সাদরে গ্রহণ করল তখন তার প্রেম আর কোন বাধা মানল না। কিন্তু সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করার পরও যদি কপালকুণ্ডলার মনে তিলমাত্র প্রভাব ফেলতে না পারে তবে ধীরে ধীরে অবসাদ তাকে গ্রাস করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই হয়েছিল। তা না হলে কাপালিকের কথা অতো সহজে সে বি(াস করত না, অথবা যে কপালকুণ্ডলাকে এত করেও সংসার এবং দাম্পত্য জীবনের কোন বোধ ও অনুভূতিই দিতে পারল না, সে কেমন করে দ্বিচারিণী হতে পারে, এ কথাও তার মনে হল না। ফলে সে কপালকুণ্ডলাকেও সুখী করতে পারল না, নিজেও সুখী হল না।

৩৭.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী-কন্যা, মনের সৃষ্টি—সুতরাং চরিত্রটি একদিকে রহস্যময়তা, অন্যদিকে সজীবতা ফোটাবার গু(দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলবার জন্যই দুটি প্রধান উপাদান বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন—প্রথমত সর্বদাই তাকে অন্ধকার রাত্রি বা আলোছায়ার পরিবেশে দেখানো, দ্বিতীয়ত রাশি রাশি কালো চুলের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখা। কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখার দৃশ্যটিই একবার মনে করে দেখুন—‘সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার—অবেণী সম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার।’

দ্বিতীয়বার যখন নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার দেখা হয় ‘তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই’ এবং পিঠে কোমলস্পর্শ পেয়ে পেছন ফিরে নবকুমার দেখেছে ‘সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্য দেবীমূর্তি।’

তৃতীয়বার মতিবিবির সঙ্গে আলাপের জন্য যখন কপালকুণ্ডলার কাছে আসে তখন ‘একটি ীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের বাড়িতে কপালকুণ্ডলাকে যখন আমরা প্রথম দেখি শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, তখনও ‘সন্ধ্যাকাল উপস্থিত’ এবং কপালকুণ্ডলা ‘অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্ধলুক্কায়িতা।’ বস্তুত এই পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার চুল বেঁধে দেবার জন্যই শ্যামাসুন্দরী সাধাসাধি করেছে কপালকুণ্ডলা রাজি হয়নি।

পরবর্তীকালে চতুর্থ খণ্ডে অন্ধকার রাত্রে কপালকুণ্ডলার ওষধি খুঁজেতে যাওয়া, অন্ধকারে ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবির সঙ্গে সা(াৎ এবং বিষাদময় পরিণতির কথা আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু ল(্য করবেন পটভূমি সবসময়েই অন্ধকার রাত্রি।

তার অর্থ এই নয় যে চরিত্রটিকে শুধু রহস্যময়ই করে রাখবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেননি। চরিত্রটি যাতে রক্ত(মাংসের সজীবতা লাভ করে সেজন্য তিনি যে কত সচেতন ছিলেন, একটু ব্যাখ্যা করলেই তা বোঝা যাবে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখিয়েছিল, সেটা তার অন্তরের স্বাভাবিক কোমলতা হতে পারে, কিন্তু কাপালিকের বন্ধন থেকে মুক্ত(করে তাকে অধিকারীর বাড়িতে নিয়ে আসায় ক(ণাবৃত্তির একেবারে চরম প্রকাশ দেখা যায়। এভাবে নবকুমারের প্রাণ বাঁচালে কাপালিক যে তাকে হত্যা করবে, এ কথা সে জানতো—অধিকারীর কাছে তা প্রকাশও করেছে। তবু যে এ কাজ সে করেছে তাতে বোঝা যায় মানবিক অনুভূতি তার

মধ্যে পুরোপুরি বজায় আছে।

সংসার ও সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ কপালকুণ্ডলা 'বিবাহ' শব্দের অর্থই বুঝতে পারেনি প্রথমে, অধিকারী কালিকা ও শিবের সম্বন্ধ এনে এটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সংসার সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার অনভিজ্ঞতা যে কত বেশি তা বোঝাবার জন্য তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত আপনাদের মনে করার। মতিবিবি প্রচুর স্বর্ণালংকার পরিয়ে দিয়েছিল কপালকুণ্ডলাকে, রাস্তায় ভিখারি সাহায্য চাওয়াতে সমস্ত অলংকারগুলি সে তার হাতে খুলে দিয়েছে। বিহ্বল ভি(ুক এদিক-ওদিক চেয়ে ঊর্দ্ধ্বোসে পলায়ন করেছে, তখন— ''কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, ভি(ুক দৌড়িল কেন?''

সপ্ত গ্রামের সংসারে এসে শ্যামাসুন্দরীর অবস্থা দেখেও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে কিছুই ধারণা জন্মায়নি, নবকুমার প্রবল প্রণয় কত দুর্লভ বস্তু একথা কখনই সে জানতে পারেনি, বরং সে বলেছে 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।

এরপর যখন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে আমাদের সা(াৎ হয় তখন সে 'এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিনী।' সাজসজ্জায় তার কিছু পারিপাট্য এসেছে, অলংকারও তার অঙ্গের ভূষণ হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলেম মনে হয় না, না হলে শ্যামাসুন্দরীকে বলতো না, 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে বিবাহ করিতাম না।'

অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। সংসার তার ভাল লাগে না, রাত্রে অরণ্যে ভ্রমণ করতে সে আনন্দ পায়, 'গৃহস্থের বউ-ঝি'র এই আচরণ ভাল কিনা সে প্র(েই তার মনে আসে না। যে পরোপকার বৃত্তি আমরা প্রথম থেকেই তার মধ্যে দেখেছি, সেই পরোপকার সাধনের জন্যই শ্যামাসুন্দরীর জন্য সে গভীর রাতে বনে ঢুকেছিল ওষধির সন্ধানে। কাপালিককে একবার দেখা সত্ত্বেও ভয়ে সে এ কাজে বিরত হয়নি। কাজেই চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি, এটাই আমাদের বলতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দাদার পরামর্শ যে পছন্দ হয়নি, উপন্যাসের পরিণতি সে কথা প্রমাণ করে। আসুন চরিত্রটি এবার আমরা একেবারে আমাদের নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে দেখার চেষ্টা করি এবং এর কোন ক্রুটি দেখতে পাই কিনা তা দেখি।

প্রথম কথা, 'কুচরিত্রা', 'অবিধ্বাসিনী' ইত্যাদি পদগুলি কপালকুণ্ডলা বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছে, যেমন—'আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' কিম্বা 'আইস, আমি অবিধ্বাসিনী কি না স্বচ(দেখিয়া যাও।' প্র(হচ্ছে, দাম্পত্য সম্পর্কই যে বোঝে না, সংসারের রীতিনীতি এখনও যার কাছে অস্পষ্ট, সে এসব কথা জানল কী করে এবং এর অর্থই বা তার কাছে পরিষ্কার হয় কেমন করে।

দ্বিতীয় কথা, যেখানে এক বছরেরও বেশি সময় বাস করছে, যাদের সঙ্গে, তাদের প্রতি একটা গভীর ভালবাসার সম্পর্ক এমনিতেই গড়ে ওঠার কথা। মানুষের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, বাড়িতে একটি গৃহপালিত পশু থাকলেও তার বাড়ি সম্বন্ধে মায়া জন্মে যায়—আর কপালকুণ্ডলার মত কোমলহৃদয়া নারী এই সংসারকে ভাল বাসতে পারল না। সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণই তার জন্মাল না। এটা কি বিধ্বাস করা সহজ।

তৃতীয় কতা, কপালকুণ্ডলা লোকালয়বর্জিত স্থানে প্রতিপালিত হলেও সে মেয়ে। যখন মানবিক বৃত্তিগুলি তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে তখন জৈববৃত্তি জাগ্রত হবে না, এটা মনে করা অসম্ভব। কাজেই নবকুমারের উন্মত্ত

ভালবাসার অর্থ সে বুঝতে পারবে না। একটি দম্পতি যেভাবে জীবনযাপন করে সেভাবে তারা জীবন কাটাবে না! জৈব প্রবৃত্তিকে কী করে একটি নারী ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তাহলে তার সন্তন সম্ভাবনা কি অনিবার্য ছিল না! আর সন্তান একবার জন্মগ্রহণ করলে একটি নারী কি আগের মত থাকতে পারে!

এই অসংগতির ব্যাখ্যা দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রেখেছেন নবকুমারের সঙ্গে বালিয়াড়ি ত্যাগের প্রাক্কালে দেবীর পা থেকে বিল্বপত্র স্খলিত হওয়া। অশি(তা ও কাপালিকলালিতা মেয়ের মনে সংস্কার প্রবল হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা সত্রি(য় থাকবে এবং একটি নারীর সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার (দ্ধ করে দেবে, এটা আমাদের স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের প্র্নের উত্তরে তাঁর অগ্রজ যা বলেছিলেন, সেই পরিণতিই যেন স্বাভাবিক হতো বলে আমাদের মনে হয়—'সন্তানাদি হইলে স্বামী-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।'

প্রান্তলিপি

মতিবিবি চরিত্রটি এমনই প্রাণবন্ত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় যেন এই মেয়েটিকেই আমরা দেখতে পাই। আপনারাও মিলিয়ে দেখতে পারেন, একটু অংশ তুলে দিচ্ছি। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে এক গুচ্ছ কবিতা আছে, তার 'নাগরী' কবিতা থেকে—

'ব্যঙ্গসুনিপুণা,
(-ষবাণসন্ধানদা(ণা।
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রুপ বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।

....

আপন তপস্যা লয়ে যে-পু(ষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে, চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।'

৩৭.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

কপালকুণ্ডলার মত একটি বিচিত্র নারীকে উপন্যাস লিখবার বাসনা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জন্মায় তখন মতিবিবি চরিত্রের কথা তাঁর মাথাতেই ছিল না। আমাদের মনে হয়, তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কপালকুণ্ডলা সংসারজীবনে ফিরে এসেও সুখী হবে না। এটাকে নিশ্চিত করার জন্যই নবকুমারের প্রথম স্ত্রী এবং স্বামীকে অধিকার করার ও সপত্নীর প্রতি প্রতিহিংসার জন্য এই চরিত্রের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, যাতে কপালকুণ্ডলার বিষণ্ণ পরিণতি একেবারে সুনিশ্চিত হয়।

বোধহয় এই কারণেই মতিবিবি চরিত্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, তাকে স্বৈরিনী নারী হিসাবে আঁকবার চেষ্টাই তিনি করেছেন, কিন্তু শিল্পী যখন একটি চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির প্রচুর উপাদান পেয়ে যান তখন তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না। ফলে চরিত্রটি সম্ভবত এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষনীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা কল্পনার সৃষ্টি, তাকে বাস্তব করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তার অসংগতি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন নি। মতিবিবি প্রয়োজনের সৃষ্টি, তাকে স্বৈরিনী ও প্রতিহিংসাপরায়ণা করবার সচেতন অভিপ্রায় সত্ত্বেও শিল্পীর প্রচ্ছন্ন সহানুভূমি তাকে সজীব ও বি্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

চরিত্রটিকে দেখার আগে তার কথা আমরা শুনি কেবল লেখকের বর্ণনায়। নবকুমারের প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী বিয়ের পর পিত্রালয়েই থাকত, মাঝে মাঝে আসতো। তেরো বছর বয়সে উড়িষ্যায় সপরিবার পাঠানের হাতে পরে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে নিজের কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও

পদ্মবতী স্বামী-পরিত্যক্ত(া হয়। পরবর্তী কালে এই নারী যে লুৎফ-উন্নিসা নাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনে ছদ্মবেশে মতিবিবি নাম গ্রহণ করে থাকে, তার পিতা আগ্রায় এসে আকবরের রাজদরবারে ওমরাহ হয়ে বসেছে, লুৎফ-উন্নিসা আগ্রায় এসে 'পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ্য ইত্যাদিতে সুশি(তা হয়েছে, এসব সংবাদ আমরা পরে পেয়েছি। জেনেছি, 'ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র (মতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। ......বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী প(চ্ছেদ কেন করাইব? অর্থাৎ পদ্মাবতী এখন স্বৈরিণী নারী, এমনকি যুবরাজ সেলিমও তার অনুরক্ত(।

মতিবিবিকে প্রথম আমরা দেখি ভাঙা পালকিতে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। রাতে নবকুমার কপালকুণ্ডলার সন্ধানে যাবার সময় এর সা(াৎ পেয়েছিল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, কপালকুণ্ডলা কী না জানতে চাওয়ায় বলেছিল, 'আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।'

তারপরই আমরা দেখেছি শুধু বাগবৈদগ্ধ্যে নয়, আচরণেও মতিবিবি আকর্ষনীয়া। বিপদে পড়ে সে শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে নবকুমারের কাঁধে ভর দিয়ে সরাইখানায় এসেছে। সেখানে নবকুমারের সঙ্গে কথোপকথনে তার বুদ্ধিমত্তা, (ে-ষবাণ সন্ধানের (মতা এবং পরিশীলিত (চি প্রমাণিত হয়।

কপালকুণ্ডলাকে দেখতে গিয়ে নিজের সমস্ত অলংকার মতিবিবি কেন তাকে দান করেছিল স্পষ্ট করে বলা শক্ত(, কিন্তু অনুমান করা শক্ত(নয়। তার আগের পরিচ্ছেদেই নবকুমারের নাম সে শুনেছে এবং একটি অব্যর্থ ইঙ্গিত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন—'প্রদীপ নিবিয়া গেল।' কপালকুণ্ডলাকে দেখতে যাবার সময় অবশ্যই তার মনে হয়েছে, যে জীবনে ফিরে যাবার সমস্ত পথ (দ্ধ, সেই জীবনেই এখন সে দর্শক মাত্র। নবকুমারের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে সাজাতে পারেনি, এখন নবকুমারের পরিত্যক্ত(া স্ত্রী হিসাবে তার নবপরিণীতা বধূকে সাজিয়ে আংশিক তৃপ্তি পেতে চেয়েছে।

তিনটি ব্যাপার এ থেকে প্রমাণিত হয়—মতিবিবির হৃদয়ের ঔদার্য এবং ফেলে আসা জীবনের জন্য স্তিমিত বাসনা ও নবকুমারের প্রতি এখনও সুপ্ত প্রেম। এগুলিরই প্রকাশ দেখা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে। যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠেছিল তার জীবনে তাকে ভুলে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে পরিবর্তিত জীবনের ভোগবিলাসকেই উত্তুঙ্গ শিখরে টেনে তুলতে চেয়েছিল। সে আশা যখন মিলিয়ে গেল, তখন এই জীবনের অপ্রাপ্তি তার মনে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হল। বিনাদোষে একদিন যে স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আজ সেই অধিকার ফিরে পাবার জন্য সে ফিরে এল সপ্তগ্রামে। কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ না করলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তাই কাপালিকের সঙ্গে সন্ধি করতে তার আপত্তি হয়নি। কিন্তু ল(করে দেখবেন, সহানুভূতি তার কপালকুণ্ডলার প্রতিও ছিল, কাপালিকের মত তার জীবনহানি সে চায়নি।

আসলে মানুষের চরিত্র দোষগুণে ভরা। কেবল দোষ বা কেবল গুণ থাকলে তাকে বাস্তব মানুষ বলে মনে করা শক্ত(। কপালকুণ্ডলাকে তাই আমরা ততটা আমাদের কাছের মানুষ মনে করতে পারি না, যতটা পারি মতিবিবিকে। মতিবিবির যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারি। সে গিয়েছিল পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শনে। ধর্মচ্যুত হয়ে তাকে যে মুসলমান হতে হয়েছিল সে দোষ তার নয়, কিন্তু তার ফলভোগ করল সে—নবকুমার তাকে ত্যাগ করল। স্বাভাবিক জীবন থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে, সে মৃগয়া বৃত্তি গ্রহণ করবে, এটা কাম্য না হতে পারে কিন্তু এটাই তো ঘটে থাকে। কিন্তু এই স্বৈরিণীবৃত্তি গ্রহণ করেও যে তার ভেতরের মানুষটা মরে

যায়নি, বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে সে কথা অনেকবার বলেছেন, যেমন—‘পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।’

বস্তুত, নবকুমার যদি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করতো, তবে কপালকুণ্ডলার বিন্দুমাত্র (তিসাধনও বোধহয় সে করতে চাইত না। নবকুমার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখনই ‘দলিতফণা ফণিনীর’ মত সে ঘোষণা করেছে ‘তুমি আমারই হইবে।’ এরপরই তার কাপালিকের সঙ্গে মন্ত্রণা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং যাবতীয় অভিনয়।

বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত চাননি, কিন্তু মতিবিবি যে কপালকুণ্ডলার চেয়েও স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর চরিত্র হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই।

৩৭.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

অপ্রধান শুধু নয়, একেবারে নগণ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে কতটা সতর্কতা এবং শৈল্পিব মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা আপনাদের মনে পড়বে যদি একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদের একটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করি। নৌকা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, বাঁচার আশা নেই শুনে পু(ষেরা দুর্গানাম জপ করতে লাগল, মেয়েরা সুর তুলে কাঁদতে লাগল—‘একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।’

এই উপন্যাসে কাপালিককে অপ্রধান চরিত্র বলে আপনাদের মনে নাও হতে পারে, কারণ তার জন্যই নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম সা(াৎ হয়েছে, আবার তার জন্যই নবকুমারের জীবনে ক(ণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় কাপালিক অপ্রধান চরিত্র এই কারণে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য পেরিয়ে কোনো সজীবতা সে লাভ করেনি। যে কপালকুণ্ডলাকে প্রায় আজন্ম সে লালনপালন করেছে, তাকে বধ করবার জন্য নিয়ে যাবার সময়ও সে একবারও ইতস্তত করেনি। এইরকম একমুখী তীব্রতা নিয়ে কোনো চরিত্র সজীবতা লাভ করতে পারে না। সপ্তগ্রামে তার আসাটাও অবি(োস্য, অধিকারী তাদের সন্ধান বলে দেবেন, এমন মনে হয় না।

অধিকারী চরিত্রটি আবার অন্য রকমের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। তবু এই চরিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে এবং সেই কারণেই চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়। প্রথমত তাঁর অন্তরে ক(ণাবৃত্তি আছে বলেই কপালকুণ্ডলাকে ঘোর বিপদ থেকে র(া করার কথা তিনি বিবেচনা করেছেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি যে তাঁর যথার্থ স্নেহ ছিল, তার বোঝা যায় মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে আসা এবং কপালকুণ্ডলার সমব্যথী হয়ে অশ্রুবিসর্জনে। অধিকারী যেভাবে নবকুমারকে বিবাহ করার জন্য রাজি করিয়েছেন তাতে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজেকে নিজেই তারিফ করে মনে মনে বলেছেন, ‘রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?’

তবু, চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু অসংগতি আছে, সেটা আপনাদেরও চোখে পড়তে পারে, যেমন ঘোর জঙ্গল এবং বালিয়াড়ির মধ্যে লোকালয়বর্জিত স্থানে অধিকারী যেখানে থাকেন সেখানে ‘এক অত্যুচ্চ দেবালয় চূড়া’ এবং ‘তন্নিকটে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহ’ থাকাটা কিছুটা বিস্ময়কর। দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকারীর শিষ্যও দু-একজন এসে থাকে (কপালকুণ্ডলার কথা—‘যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে’ ইত্যাদি)। তৃতীয়ত সেখানে নাকি হিজলীর বহুলোক পুজো দেয়, অধিকারী বলেছেন—‘পরমে(রীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়।’

এত লোক যেখানে পূজা দেয় সেটি নির্জন স্থান হবে কেমন করে।

নারী চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেতে পারে শ্যামাসুন্দরী। বোঝাই যায়, কপালকুণ্ডলার উদাসীনতাকে স্পষ্টতর করবার জন্যই এই স্বামীপ্রেমবুভু(চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। সে সময়ের কৌলীন্য প্রথার অসুন্দর দিকটিও এতে ফুটে উঠেছে। নবকুমারের এই ভগ্নীর বিবাহ এক কুলীনের সঙ্গে হয়েছিল বলেই তার সপত্নীও ছিল অনেক। শ্যামাসুন্দরী ছোটবেলায় শেখা ছড়া জানে, বৌদির কেশসজ্জার উৎসাহ তার আছে, মেয়েদের জীবনের 'পরশ-পাথর' যে পু(যের প্রেম, সেকথা শ্যামাসুন্দরী জানে, এবং এও জানে যে 'সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে'—এর চেয়ে বড় চাওয়া মেয়েদের আর কিছু হতে পারে না। কেন মেয়েদের এত সাজসজ্জা, এ কথা বোঝাতে গিয়ে শ্যামা-সুন্দরী সুন্দর একটি উপমা দেয়, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ', কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাতেও যখন উদাসীন তখন তার গভীর হৃদয়বেদনা এই উক্তি(তে ধরা পড়ে—'ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম তবে ফুটিয়া সুখ হইত।'

আসলে, শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে কাছে রাখবার জন্য, তাঁকে বশ করার জন্য ওষধি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর কপালকুণ্ডলা নবকুমারের আকুল প্রেম উপে(া করে যোগিনী হয়ে বসে থাকে—এই বৈপরীত্যটি শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের সাহায্যে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

মেহেরউন্নিসা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তার উল্লেখই শুধু আছে, চরিত্র হিসাবে তাকে ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ পাওয়া যায় নি। তবু এরই মধ্যে কিন্তু চরিত্রের পাঠানোচিত দৃঢ়তা, ব্যক্তি(ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার সেই সঙ্গে সেলিমের প্রতি তার আন্তরিক দুর্বলতাও ঢাকা থাকে নি। মতিবিবি যখন জানায় মেহেরউন্নিসার প্রেমে মুগ্ধ সেলিম তাকে পাবার জন্য সব কিছুই করতে পারেন, তখন মেহেরউন্নিসা বলে, 'বৈধব্যের আশঙ্কা। শের আফগান আত্মর(ায় অ(ম নহে।' মতিবিবি যখন চিত্রাঙ্কনে তার দ(তার প্রশংসা করে বলে অন্যের এ(মতা থাকলে মেহেরউন্নিসার অপূর্বরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত থাকতো, মেহের বলে, 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।' ফের এই মতিবিবিই যখন সংবাদ দেয় আকবরের মৃত্যু হয়েছে, সেলিম এবং সিংহাসনে, মেহের-উন্নিসা চোখের জল সামলাতে পারে না, নি(াস ত্যাগ করে বলে, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

এত স্বপ্ন অবসরে চরিত্র অঙ্কনের এমন দ(তা অল্পই দেখা যায়।

৩৭.১০ সার-সংক্ষেপ

এখানে আমরা চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণভাবে মূল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কীরকম দ(তা দেখিয়েছেন সেটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। প্রথমেই প্রধান চরিত্র এবং অপ্রধান চরিত্রের পার্থক্যটা আমরা বুঝে নিয়েছি এবং অপ্রধান চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারেও লেখকের দৃষ্টি কেন থাকা দরকার, সে কথা বলেছি।

এবার প্রধান চরিত্রের মধ্যে আলোচনা করেছি নবকুমার, কপালকুণ্ডলা এবং মতিবিবির। উপন্যাসটি নারীপ্রধান বলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নবকুমার চরিত্রটি বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও, এখানে ঘটনা বলতে যা আছে তাতে নবকুমারের ভূমিকা অল্প। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি কত যত্নে বঙ্কিমচন্দ্র আঁকবার

চেষ্টা করেছেন সে কথা আলোচনা করা হয়েছে। রহস্যময়তা ও বাস্তগুণের সংমিশ্রণে চরিত্রটি অভিনব হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরো বেশি সজীব চরিত্র হয়েছে মতিবিবি, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই বোধহয় একমত হবো।

অপ্রধান চত্রি নির্মাণেও বঙ্কিমচন্দ্র কত দ(ছিলেন তা আমরা দেখিয়েছি এবং এই দ(তা কাপালিক, অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী এবং মেহের-উন্নিসার চরিত্রসৃষ্টিতে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সেটা দেখিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে।

৩৭.১১ কপালকুণ্ডলার শ্রেণীবিচার

একটি উপন্যাসের পরিচয় সম্পূর্ণ জানা না হলে তার শ্রেণীবিচার করা শক্ত(। এখন আমরা তার পরিচয় মোটামুটিভাবে সব দিক থেকেই জানি, বলতে পারি। যিনি প্রথম এই উপন্যাস পড়তে যাবেন, একটা ব্যাপারে তাঁর একটু খটকা লাগতে পারে, কারণ 'কপালকুণ্ডলা' নাম হিসাবে কিছুটা বিস্ময়কর, যখন দেখা যাবে এর অন্যতম প্রধান নারীচরিত্রের নামই এই, তখন বিস্ময় আরো বাড়বে, কারণ এরকম নাম সাধারণত কোন স্ত্রীলোকের হয় না।

এ বিষয়ে যাঁরা কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, নামটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটক থেকে। সেখানেও অঘোরঘন্ট নামে এক কাপালিক আছে এবং তাঁর এক শিষ্যাও আছে কপালকুণ্ডলা নামে। তবে আপনারা যদি সেই নাটক পড়েন, তাহলে দেখবেন, যেখানে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি উপন্যাসের চরিত্রের ঠিক বিপরীত আমাদের কপালকুণ্ডলা কাপালিকের গ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, ভবভূতির কপালকুণ্ডলা কাপালিকের জন্য নরবলির জোগাড় করে।

আসলে, এই উপন্যাসের উৎস সম্বন্ধে আমরা জানি, এটি বঙ্কিমচন্দ্রে একটি পরী(ামূলক গ্রন্থ। মনের একটি গভীর চিন্তাকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেন। যে মেয়ে প্রায় আজন্ম লোকালয় থেকে দূরে আছে, যৌবনে তার বিবাহ দিলে সে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারবে কিনা, এই ছিল প্র(। এটা দেখাবার জন্য একটি মেয়েকে নিতান্ত শৈশবে কোন নির্জন জায়গায় নির্বাসিত দেখাতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, নির্জন বালিয়াড়িতে কাপালিক এই মেয়েকে লালিত করেছে। কাপালিকের দেওয়া নাম এই ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এটি কালীর নামান্তর। অধিকারী নিজেও স্নেহভরে কখনও কখনও তাকে কাপালিনী বলে ডেকেছেন। যাইহোক, একে আমরা কোন জাতীয় সৃষ্টি বলবো সে ব্যাপারে এবার চিন্তা করা যাক।

৩৭.১১.১ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্য

কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, কপালকুণ্ডলা আসলে একটি গদ্য কাব্য। একথা অবশ্য ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্য(ে ত্রে অবতীর্ণ হন। এ কথাও মিথ্যা নয় যে কপালকুণ্ডলার মধ্যে এমন এক গভীর অনুভূতিমূলক চিন্তা আছে, মহৎকাব্যেই সেরকম চিন্তা দেখা যায়। তাছাড়া এমন এক রহস্যময় পরিমণ্ডল বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন—নির্জন সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, দৈবদুর্বিপাকে নবকুমারের সেখানে নির্বাসন, রহস্যময় কাপালিক, তার চেয়েও রহস্যময়ী নারী কপালকুণ্ডলা এবং তার ব্যাকুল আহ্বান—

সমস্ত মিলে একটা কাব্যিক ব্যঞ্জনাই যে ফুটে ওঠে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই গ্রন্থের কাব্যিক ল(ণ আরো আছে। সমগ্র গ্রন্থে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র যার কাব্যিক সুষমা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। দু-এক পংক্তি(উদ্ধার করলে আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন—'মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি(ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবণ, ঘনকৃষ(চিকুরজাল(পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে, না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি(অনুভূত হয় না।'

গ্রন্থের মধ্যে মধ্যেই এমন কিছু ব্যঞ্জনধর্মী পংক্তি(আছে যার সা(াৎ কাব্যেই পাওয়া স্বাভাবিক, যেমন—

ক) ''মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পারি না?'
নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্মা।'
প্রদীপ নিবিয়া গেল।''

খ) 'ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্ত(শিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।'

গ) 'লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।'

এত কাব্যিক ল(ণ সত্ত্বেও বলতে হবে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য কাব্য নয়, কারণ কাব্যের আখ্যান এবং চরিত্রসৃষ্টির কোন দায় থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে এর আখ্যান রচনা করেছেন তাই নয় সেই আখ্যানকে বি(াসযোগ্য করে তুলবার জন্য কার্যকারণ শৃঙ্খল সমন্বিত সুবিন্যস্ত বৃত্তে পরিণত করেছেন। চরিত্র শুধু আখ্যানের অবলম্বন হিসাবে আসে নি, তাদের জীবন্ত করার আপ্রাণ চেষ্টাও তিনি করেছেন। সুতরাং কাব্যিক সুষমা এর উপভোগ্যতা অনেক বাড়াতে পারে, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে একে গদ্য কাব্য বললে এর প্রতি সুবিচার করা হবে না বলেই আমরা মনে করি।

৩৭.১১.২ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি উপন্যাস

উপন্যাসের যেসব ল(ণের কথা আমরা জানি, সেগুলি মনে রেখে বিচার করতে গেলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে কপালকুণ্ডলা একটি উপন্যাস। কারণ উপন্যাসের যে ল(ণগুলি ২ নং এককে আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন সেগুলিই একবার মনে ক(ন। এর মধ্যে উপন্যাসের দুটি শর্ত, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ছাপাখানার আবিষ্কার আমরা বাদ দিয়ে শুধু ল(ণগুলি বিচার করছি।

ক) উপন্যাসে আমরা প্রথম পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্প। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে দৈবী সংস্কার ও বি(াসের একা পরিমণ্ডল আছে বটে, কিন্তু এ গল্প মানুষের গল্প এবং সুনিশ্চিত ভাবে মানুষেরই গল্প। নবকুমার সৌন্দর্যপ্রেমিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক একটি যুবক, নানারকম ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রথমা স্ত্রীকে হারিয়েছিল, আবার জীবনে কৃতজ্ঞতাসূত্রে একটি নারী এসেও ছিল। তাকে নবকুমার হৃদয়ের সংরক্ত(প্রেম নিবেদন করেছিল, ভালবাসার একটি সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই নারী যেহেতু ভিন্ন পরিবেশে মানুষ, লোকালয় ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা অল্প, সুতরাং সংসারজীবন সম্বন্ধে তার উদাসীনতা কাটেনি। নবকুমার সুখী হয়নি, কারণ তার হৃদয়ে প্রেম সে জাগ্রত করতে পারে নি। পাশাপাশি পেয়েছি জীবনতৃষ(ার প্রতীক স্বরূপ নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে, প্রেম না পেলে নিজের দাম্পতয

অধিকারে যা সে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ছলে-বলে কৌশলে। কাজেই এই আদ্যন্ত মানবিক বিষয়টি যে অবশ্যই উপন্যাসের উপযোগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রাণ। উপন্যাস সৃষ্টির আগে রূপকথার গল্প, দেবদেবীর গল্প অনেক প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেসব ছিল অলৌকিক। উপন্যাস মানুষের গল্প বলেই সেখানে বি(্বাসযোগ্যতার একটা ব্যাপার আছে। সেই কারণেই উপন্যাসে বৃত্ত নির্মাণ করতে হয় যাতে সমগ্র গল্পটা বাঁধা থাকে একটা কার্যকারণ সূত্রে। আমরা দেখেছি, ঠিক সেই নিয়ম মেনেই কপালকুণ্ডলার গোটা গল্পটাই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুচিন্তিত বৃত্তে বা plot-এ রূপায়িত করেছেন। কাজেই সেদিক থেকেই একে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হবে।

গ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের একটি নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সেটি যে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ছিল,—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। সেই জন্যই অন্যান্যদের মতকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী জীবনের যে রূপ প্রতিভাত হওয়া উচিত, চরিত্র যেরকম আচরণ করা উচিত বলে মনে হয়েছে, তাই তিনি দেখিয়েছেন। মানুষ পশু নয় বলেই প্রাথমিক জীবনাচরণের প্রভাব তার জীবনে অলঙঘ্য, দাম্পত্য জীবনের মূল প্রেমে, জৈব তাড়নায় নয় এবং সেই প্রেম জীবনের ষোল বছর পর্যন্ত যার মনে জাগবার কোন অবকাশই ছিল না, পরেও পরিণত হবার পর তা জাগতে পারে না—এই ধরনের একটা জীবনবোধই মনে হয় এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই গ্রন্থকে উপন্যাস আখ্যা না দেবার কোন কারণ নেই।

৩৭.১১.৩ ‘কপালকুণ্ডলা’ ঃ একটি রোমান্স

কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস হিসাবে স্বীকার করে নিলেও আমরা দেখবো, এটি একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাস, কারণ এখানে যেসব পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আমাদের সা(াৎ হয়, তারা কেউই আমাদের খুব পরিচিত নয়।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমাদের পরিচিত কিনা, উপন্যাসের ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে কিনা, এইসব বিচার থেকে উপন্যাসকে যে দুটিভাগে ভাগ করা হয়, সে কথা আমরা জানি। যেখানে আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও ঘটনা আহরণ করা হয়, তাকে আমরা বলি ‘নভেল’ এবং যেখানে পাত্রপাত্রী আমাদের অপরিচিত, ঘটনাধারাও ঠিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, অথচ মানবিক সুখদুঃখের কাহিনী এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, যাতে আধুনিক পাঠকের তাতে উৎসাহিত হবার কারণ থাকে, সে ধরনের উপন্যাসকে আমরা বলি ‘রোমান্স’। কপালকুণ্ডলায় যেহেতু এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির ঘটেছে অথচ তীব্র মানবিক আখ্যান আমাদের কাছে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, একে আমরা ‘রোমান্সজাতীয় উপন্যাস’ হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে পারি।

৩৭.১১.৪ ‘কপালকুণ্ডলা’ ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

রোমান্সজাতীয় উপন্যাসেরও দুটি ভাগ আছে, সে কথা আমরা জানি। যে রোমান্সের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় ইতিহাস থেকে, তাকে আমরা বলি ‘ঐতিহাসিক রোমান্স’ এবং যে রোমান্সের বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনাতেই প্রথম দেখা দেয়, তারপর বাস্তব পরিবেশ, বি(্বাসযোগ্য পাত্র-পাত্রী এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য কাহিনীর দ্বারা সাহিত্যে তার রূপ দেবার চেষ্টা করেন, তাকে বলা হয় ‘কাবিযক রোমান্স’।

একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো, ‘কপালকুণ্ডলা’কে আমরা ‘কাব্যিক রোমান্সে’র পর্যায়েই ফেলতে পারি। এখানে অবশ্য ইতিহাসের কিছু অনুষঙ্গ আছে, সম্রাট আকবরের মৃত্যু এবং যুবরাজ সেলিমের রাজত্বভার গ্রহণের মত গু(ত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক পর্বকেও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তা সবই এসেছে একটি উপকাহিনীর চরিত্র মতিবিবির মাধ্যমে। কাজেই এর দ্বারা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য কিচুটা সৃষ্টি হয়েছে বটে, সমগ্র কাহিনীটির বাস্তবতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল পরিকল্পনা যে ‘কাব্যিক রোমান্সে’র সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ।

‘কাব্যিক রোমান্সে’র জন্ম যেভাবে হয়, ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যাবে,—এর সৃষ্টিও সেইভাবেই হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, জীবন বিষয়ে একটি জটিল জিজ্ঞাসা আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হয়েছিল। সেই জিজ্ঞাসার কতা আমরা বার বার বলেছি, সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই বোধ হয়। মনের এই প্র(েটির সাহিত্যিক মীমাংসা খুঁজবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র, ‘বাল্যকালে খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত’ এবং ‘সমুদ্রতীরে ত্যক্ত(’ একটি নারীর কথা কল্পনা করতে হয়েছিল, তন্ত্রসাধক কাপালিকের দ্বারা লালন এবং কপালকুণ্ডলা নামকরণ করাতে হয়েছিল, নবকুমারকে দৈব দুর্বিপাকে সেখানে নিয়ে যেতে হয়েছিল, ঘটনাত্র(মে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসাযী করতে হয়েছিল এবং লোকালয়ে বসবাসের ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল। তারপর দেখাতে হয়েছিল মূলত তার সংসার ও দাম্পত্যজীবনে অনীহা এবং সপত্নী পদ্মাবতীর প্রতিহিংসা সাধনের প্রচেষ্টার কীভাবে তার জীবনে ক(ণ পরিণতি নেমে এল। কাজেই সৃষ্টি প্রত্রি(য়ার দিক থেকে একে অবশ্যই বলতে হবে কাব্যিক রোমান্স।

তবে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে প্রত্রি(য়ার মিল থাকলেই তাকে যথার্থ ‘রোমান্স’ আমরা আখ্যা দিতে পারি না, কাহিনী বাস্তব করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও নিষ্ঠা লেখকের থাকা প্রয়োজন। তাও যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং কপালকুণ্ডলার শ্রেণী সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সংশয় থাকতে পারে না।

৩৭.১১.৫ সার-সংক্ষেপ

উপন্যাসের আলোচনা সব দিক থেকে করা হলে, বলা সম্ভব এটি কী জাতীয় উপন্যাস বা আদৌ উপন্যাস কিনা। ‘কপালকুণ্ডলা’ গ্রন্থটির আলোচনা মোটামুটি ভাবে শেষ হয়েছে, সুতরাং এইবার আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

‘কপালকুণ্ডলা’কে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন ‘গদ্যকাব্য’ কারণ এর মধ্যে লেখকের এক গাঢ় অনুভূতির প্রকাশ আমরা দেখি, সর্বব্যপ্ত একটা রহস্যময় পরিমণ্ডলী দেখি এবং পাত্র-পাত্রীদের আচরণও কেমন রহস্যময় মনে হয়। এ ছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় এমন কাব্যিক ভাষার ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাঝে মাঝে এমন ব্যঞ্জনাময় উক্তি(করেছেন যে একে কাব্য বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এটি কাব্য নয়, এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত আছে এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে। কোন কাব্যেরই এগুলি থাকে না। সুতরাং একে ‘কাব্য’ বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

‘কপালকুণ্ডলা’কে উপন্যাসই বলতে হবে, তবে ‘নভেলজাতীয় উপন্যাস’ নয়, ‘রোমান্স ধরনের উপন্যাস’। ‘রোমান্স’ও দুরকমের হতে পারে—‘ঐতিহাসিক রোমান্স’ এবং ‘কাব্যিক রোমান্স’। এদের যেসব ল(ণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, তা মনে রাখলে একে ‘কাব্যিক রোমান্স’ বলাই সংগত হবে।

৩৭.১২ সারাংশ

'কপালকুণ্ডলা'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর সমকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তিনিই প্রথম উপন্যাসে প্রাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে স(ম হয়েছিলেন—একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে ব্যপৃত থেকেও সাহিত্যের সৃজনশীলতায় তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই বিচরণ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'।

উপন্যাস আধুনিক কালের ফসল, যখন মানুষ দেবকেন্দ্রিক মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে মানবজগৎ সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠছে। তাই সব উপন্যাসই মানুষের গল্প, মানবিক অনুভূতির গল্প। কখনও সে সুদূর ইতিহাসচারী বা কল্পনাপ্রসূত মানুষের রোমান্সধর্মী চরিতকথা, কখনও বা সে বাস্তব, প্রত্য(অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানবজীবনের প্রতিলিপি, নভেল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডার—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই পূর্ণ হয়ে উঠছিল, যার মধ্যে অন্যতম সফল অবদান—বঙ্কিমচন্দ্রের।

'কপালকুণ্ডলা'র মূলকানিহী নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কেন্দ্রিক হলেও তাতে দুটি উপকাহিনী সংযোজিত হয়েছে—মতিবিবির গল্প ও শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই দুটি কাহিনী উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে, গল্পের পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং এই দুই চরিত্রের তীব্র সংসারাসক্তি(ও দাম্পত্যজীবনের তৃষ(ার বিপরীতে কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তি(কে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এই উপন্যাসের কাহিনীকে পাঠকের কাছে বি(াসযোগ্য করে তুলতে সময় নির্ধারণের দিকে লেখক সচেতন দৃষ্টি দিয়েছেন। স্পষ্ট সময় নির্দেশ বা ঐতিহাসিক ঘটনার সা(্য মূলকাহিনীকে সম্ভাব্যতার জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবারফলে সমগ্র কাহিনী পাঠকের কাছে বি(াসযোগ্য হয়ে ওঠে অতি সহজেই।

সমগ্র উপন্যাসটি নারীপ্রধান। নবকুমার বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও ঘটনাবলীতে তার ভূমিকা গৌণ। রহস্যময়তা ও বাস্তবগুণের সংমিশ্রণে কপালকুণ্ডলা লেখকের এক অভিনব সৃষ্টি। তবে পাশাপাশি মতিবিবির চরিত্রটি বরং অধিকতর সজীব, মনোগ্রাহী। বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রের নির্মাণেও লেখকের যত্ন ও দ(তা আমাদের চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

'কপালকুণ্ডলা'-র রহস্যময় পরিমণ্ডলী, কাব্যিক ভাষারীতি, ব্যঞ্জনাময় উক্ত(এবং প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশময়তা অনেকের কাছেই একে 'গদ্যকাব্য'-এর পরিচয়ে উপনীত করেছে। কিন্তু যেহেতু এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে যা কোনো কাব্যে থাকে না, সেই হেতু একে 'কাব্য' বলা ঠিক নয়। এটি উপন্যাসই, তবে এর বিশিষ্ট চরিত্রল(ণ অনুযায়ী একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগত।

৩৭.১৩ অনুশীলনী

অনুশীলনী ৫২

১) এ কথা কি ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র একাই কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.—পরী(ায় পাশ করেন?

২) বঙ্কিমচন্দ্র মোট কটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন?

৩) যে মন্তব্যটি সঠিক সেটি চিহ্নিত করুন—

ক) বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসই রচনা করেছেন।

খ) বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রবন্ধই রচনা করেছেন

গ) বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে কিছু রচনা করেন নি।

ঘ) উপন্যাস এবং প্রবন্ধ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিছু ইংরেজি রচনাও আছে।

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের ——— উপন্যাস নয়, ——— উপন্যাস।

অনুশীলনী ৫৩

১) মধ্যযুগের আখ্যানের সঙ্গে উপন্যাসের আখ্যানের কোনও পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেটা কী?

২) উপন্যাস সৃষ্টির জন্য এমন দুটি শর্তের কথা বলুন যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি কী বলুন।

৪) মন্তব্যগুলির সত্যাসত্য বিচার করুন এবং অসত্য হলে তার কারণ বুঝিয়ে দিন।

ক) নভেলে থাকে আমাদের চেনা মানুষের গল্প।

খ) ইতিহাস থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেই তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয়ে যায়।

গ) কাল্পনিক ধারণা নিয়ে যুক্তিসংগত ভাবে আখ্যান রচনা করলেই তা কাব্যিক রোমান্স হতে পারে।

ঘ) রোমান্স মানেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়া।

৫) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌গুলি নভেল এবং কোন্‌গুলি ঐতিহাসিক রোমান্স তার শ্রেণীবিভাগ করুন।

৬) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা নভেল রচনার চেষ্টা হয়েছিল কি? হলে সেরকম গ্রন্থগুলির নাম করুন।

৭) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ঐতিহাসিক রোমান্স রচিত হয়েছিল কি? হলে কার লেখা, কী গ্রন্থ? তাকে উপন্যাস বলা যায় কি?

৮) প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম এবং গ্রন্থনাম ভুলভাবে সাজানো আছে, আপনি সঠিকভাবে সাজিয়ে দিন—

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	টেকচাঁদ ঠাকুর	নববাবুবিলাস
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	প্রমথনাথ শর্মা	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নকসা

অনুশীলনী ৫৪.৩

১) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে পান?

২) উপকাহিনী কাকে বলে? উপন্যাসে উপকাহিনীর দরকার হয় কেন?

৩) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে উপকাহিনী আছে কি? কী জন্য লেখক সেগুলি সৃষ্টি করেছেন?

৪) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্(দিন।

ক) কপালকুণ্ডলার আর একটি নাম— বনবালা / কপালিকা / মৃণ্ময়ী।

খ) নবকুমারের প্রথম স্ত্রী নাম— পদ্মাবতী / মতিবিবি / লুৎফ-উন্নিসা / সবগুলিই / কোনটিই নয়।

গ) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষে মৃত্যু হল— কাপালিকের / মতিবিবির / কপালকুণ্ডলার / নবকুমারের / কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের / ঠিক জানা যায় না।

ঘ) কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে র(া করেছিল— কপালকুণ্ডলা / অধিকারী / দুজনেই।

অনুশীলনী ৫৪.৫

১) কাহিনী এবং বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য কী?

২) সাধারণভাবে বৃত্ত কত রকমের ও কী কী?

৩) বাক্যগুলির একটি 'হ্যাঁ' বা 'না' বসান—

ক) কপালকুণ্ডলার শুধু কাহিনী আছে, বৃত্ত নেই—

খ) কপালকুণ্ডলায় কোনো স্বপ্নদৃশ্য নেই—

গ) উপকাহিনীর আলোচনা বৃত্তগঠনের মধ্যেই পড়ে—

অনুশীলনী ৫৪.৭

১) কপালকুণ্ডলা-র কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির কী দরকার ছিল, তার দুটি কারণ উল্লেখ ক(ন।

২) ক) যুবরাজ সেলিমের পিতা কে? খ) সেলিমের প্রধান মহিষী কে ছিলেন? গ) শেষ আফগানের স্ত্রীর নাম কি? ঘ) তাঁকে সেলিম গ্রহণ করেছিলেন কি না উপন্যাসে তার উল্লেখ না থাকার কারণ কি?

৩) নিম্নলিখিত প্র(্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা ক(ন—

ক) মোট কতগুলি শীর্ষ উদ্ধৃতি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে?

খ) নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের কোন্ কোন্ নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

গ) সংস্কৃত কোন্ কোন্ কবির কী কী নাটক ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

ঘ) বাংলা কোনও কাব্য ও নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও উদ্ধৃতি দিয়েছেন কি?

ঙ) ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাদের কবিতার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে?

৪) বাঁদিকে কিছু গ্রন্থের নাম আছে, ডানদিকে সাহিত্যিকদের নাম। গ্রন্থের পাশে সঠিক গ্রন্থকারের যে ত্র(ম উল্লেখ আছে, সেটি বসান।

<u>প্রকৃত নাম</u>	<u>গ্রন্থনাম</u>
কমেডি অব এররস ( )	ক) লর্ড বায়রন
মেঘনাদবধ কাব্য ( )	ক) কালিদাস
নবীন তপস্বিনী ( )	গ) কবীন্দ্র ভট্টাচার্য
লুত্রে(শিয়া ( )	ঘ) শেকস্‌পীয়র
উদ্ধব দূত ( )	ঙ) মধুসূদন দত্ত
লাওডামিয়া ( )	চ) জন কীটস
লেইজ অব এনশেন্ট রোম ( )	ছ) লর্ড লীটন
ওড টু এ নাইটিংগেল ( )	জ) ওয়র্ডসওয়র্থ
ডন জুয়ান ( )	ঝ) মেকলে
মেঘদূতম্ ( )	এ() দীনবন্ধু মিত্র

অনুশীলনী ৫৪.৯

১) চরিত্রসৃষ্টি বলতে আপনি কী বোঝেন?

২) কপালকুণ্ডলার পু(ষ চরিত্রগুলির মধ্যে কাকে প্রধান মনে করেন, বুঝিয়ে দিন।

৩) কপালকুণ্ডলার নারীচরিত্রদের মধ্যে আপনি কাকে প্রধান্য দেবেন বুঝিয়ে বলুন।

৪) উক্তি(গুলি সত্য হলে পাশ টিক চিহ্((√) দিন, ভুল হলে ত্র(শ চিহ্((×) দিন—

ক) কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে আনার সময় নবকুমারের মাতা জীবিত ছিলেন—

খ) শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের একমাত্র ভগিনী—

গ) কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করতে নবকুমারের মা প্রথমে রাজি হয়নি—

ঘ) মতিবিবি আগ্রায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন—

ঙ) বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের দুটি হাতই ভেঙে গিয়েছিল—

চ) অধিকারীর ভবানীমন্দিরে কেউ কখনও পূজা দেয় নি—

অনুশীলনী ৫৪.১১

১) 'কপালকুণ্ডলা' নামটি কি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই কল্পনা? উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্রের নাম এমন অদ্ভুত কেন?

২) গ্রন্থের শ্রেণীবিচার বলতে কী বোঝায়? 'কপালকুণ্ডলা'র শ্রেণীবিচার করার জন্য আমরা কীভাবে অগ্রসর হবো?

৫৪.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী

১) 'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাস না বলে অনেকে কাব্য বলতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

২) এক সমালোচকের মতে 'কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাস নয়(ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাট্য।' আপনি এই মত সমর্থন করেন কি?

৩) 'কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে'র শ্রেণীবিচার ক(ন।

৪) উপন্যাসে উপকাহিনীর প্রয়োজন হয় কেন? কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উপকাহিনী কী? এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আপনার মনে হয় কি?

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের কোন পরিচয় আছে বলে মনে করেন কি? উপন্যাসের মত আধুনিক সাহিত্যে এর কি কোন দরকার ছিল?

৬) কপালকুণ্ডলাকে প্রায় সর্বদাই অন্ধকারে দেখানো হয়েছে, দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাকে আমরা বিশেষ দেখতে পাইনা। এর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

৭) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎস কী? এ বিষয়ে যা জানা যায় তার পরিচয় দিন।

৮) কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা ভেবেছেন এবং পরিণতি যেরকম দেখিয়েছেন, তা কি আপনার স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে এর স্বাভাবিক পরিণতি কী হতে পারতো বলে আপনি মনে করেন?

৯) গ্রন্থের নাম যখন 'কপালকুণ্ডলা' তখন কপালকুণ্ডলাকেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকা করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন মতিবিবিই অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

১০) 'কপালকুণ্ডলার' কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সতর্ক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও একে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা সংগত নয় কেন, বুঝিয়ে দিন।

৩৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

২) শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

৩) প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত ঃ উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম

৪) মোহিতলাল মজুমদার ঃ বঙ্কিম-বরণ

৫) বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৩৭.১৫ উত্তরমালা

উত্তর — ৫২

১) না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্নাতক পরী(া বা বি. এ. পরী(ায় পাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরো একজন পাশ করেন—যদুনাথ বসু।

২) এগারোটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর তিনটি ছোট উপন্যাস বা খণ্ডোপন্যাস। অবশ্য ইংরেজি উপন্যাস 'Rajmohan's Wife'-এর কথা ধরলে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হবে বারোটি।

৩) (ঘ)

৪) [কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্বন্ধে আপনি এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই জানেন না, কেবল কোন্‌টি প্রথম বা দ্বিতীয় সেটুকুই জানেন। তাই শূন্যস্থান পূরণও সেইভাবেই করবেন—]

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়, দ্বিতীয় উপন্যাস।

[এ(েত্রে আপনাকে Rajmohan's Wife-এর কথা মনে রাখতে হবে না, কারণ বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় তাকে ধরা হয় না।]

উত্তর — ৫৩

১) মধ্যযুগেও আখ্যান বা গল্প ছিল, কিন্তু তা ছিল প্রধানত দেবদেবীর কাহিনী, উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্প। মানুষের গল্প বলেই উপন্যাসে অলৌকিক বা অবি(াস্য ঘটনার কথা বিশেস থাকে না, মধ্যযুগে দেবদেবীর গল্প শোনার হতো বলে অবি(াস্য মাহাত্ম্য কথাও থাকতো অনেক বেশি, নইলে তাঁদের অসাধারণ (মতার বি(াস জন্মায় না সাধারণ মানুষের।

২) উপন্যাস সৃষ্টির দুটি মৌলিক শর্ত হল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার।

৩) উপন্যাসের প্রধান ল(ণগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সারাংশেও তার উল্লেখ আছে। আপনারা বিশদভাবেই আলোচনা করতে পারেন এই প্র(ে কত মানাঙ্ক দেওয়া আছে তার ওপর নির্ভর করে। সাংরাশের মূল সূত্রগুলি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—

ক) উপন্যাসের কাহিনী হবে মানুষের ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন।

খ) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ওপর উপন্যাস সৃষ্টি নির্ভরশীল।

গ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান ল(ণ।

ঘ) ছাপাখানার আবিষ্কার উপন্যাস সৃষ্টির এক প্রধান শর্ত।

ঙ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

৪) ক) সত্য

খ) অসত্য। ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা সেই কাহিনীতে যথেষ্ট মানবিক আবেদন বা মানুষের ভালো লাগার মত উপাদান না থাকলে তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয় না।

গ) সত্য।

ঘ) অসত্য। কারণ, রোমান্স তো উপন্যাসেরই একটি প্রকারভেদ এবং উপন্যাসের প্রধান গুণ— বাস্তবতা(কাজেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলে তাকে কখনই আমরা 'উপন্যাস' বলতে পারবো না, আর যাকে 'উপন্যাস' বলা চলে না তাকে 'রোমান্স' বলার কোন কারণ নেই।

৫) এই শ্রেণীবিভাগ আমরা করেই দিয়েছি, আপনি ৫৩.৪.২ অংশটি দেখে নিয়ে অনায়াসে উত্তর করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার নিজের যদি অন্যরকম কোন সিদ্ধান্ত হয়, আপনি তাও জানাতে পারেন।

৬) হ্যাঁ, হয়েছিল। প্রথম গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে, নাম 'নববাবু-বিলাস'। দ্বিতীয় নভেল লেখার চেষ্টা হয়েছিল ১৮৫৮ সালে, গ্রন্থের নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। তৃতীয় গ্রন্থটি রচিত হয় ১৮৫২ সালে, নাম 'ক(ণা ও ফুলমণির বিবরণ'। হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামে আরো একটি গ্রন্থ রচিত হয়, সেটির প্রকাশকাল ১৮৬২ সাল।

৭) হ্যাঁ, 'ঐতিহাসিক রোমান্স' লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। পূর্ণাঙ্গ রোমান্স হলে তাকে হয়তো 'উপন্যাস' বলা চলতো, কিন্তু গ্রন্থটি আসলে দুটি (ুদ্র কাহিনীর সংকলন। তাই একে 'উপন্যাস' না বলাই বাঞ্ছনীয়।

৮) সঠিক সাজানো এইরকম হবে ঃ

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নক্সা
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রমথনাথ শর্মা	নববাবু বিলাস

উত্তর — ৫৪.৩

১) কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়ায় বদলি হয়েছিলেন, এক কাপালিকের দেখা পেতেন মাঝরাতে। এঁকে দেখেই সম্ভবত মাথায় একটা প্র(া এসেছিল, কোন নারী যদি লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত অবস্থায় বড় হয়, তবে যৌবনে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলে তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে কিনা। এর উত্তর সন্ধানের জন্যই যে উপন্যাসটি লেখা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সেই কথাই বলা হয়েছে।

২) এই প্র(ের উত্তর আপনারাই দিতে পারবেন। এই এককের ৫৪.৪ এবং ৫৪.৪.১ অংশদুটিকে সং(েপে লিখলেই এর উত্তর হয়ে যাবে।

৩) এর উত্তরও নিজে লেখার চেষ্টা ক(ন। ৫৪.৪.২ অংশে এর উত্তর সাজানোই আছে।

৪) ক) মৃণ্ময়ী।

খ) সবগুলিই।

গ) ঠিক জানা যায় না।

[ভেসে যাওয়ার কথা আছে, মৃত্যুর কথা নেই]

ঘ) দুজনেই

[এটা একটা শক্ত(প্র(, কারণ যে-কোন উত্তরই ঠিক, তবে শেষেরটা যে সবচেয়ে উপযুক্ত(উত্তর, আপনারা একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবেন]

উত্তর — ৫৪.৫

১) কাহিনী বলতে বোঝায় উপন্যাসের আখ্যান বা গল্পটা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'story' এবং বৃত্ত বলতে বোঝায় সেই গল্পের বিন্যাস, যাকে ইংরেজিতে বলি আমরা 'প-ট'। কাহিনীর মধ্যে কেবল পাঠকের কৌতূহলবৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয়, অর্থাৎ তারপর কী হল, তারপর? এইভাবে কাহিনী এগিয়ে যায়। বৃত্তে থাকতে হবে সেই সঙ্গে কার্যকারণের শৃঙ্খলা—এইজন্যে এটা হল, এই জন্যে ওটা হল, এইরকম। এক কথায় বলা যেতে পারে, বৃত্ত একটা সুশৃঙ্খল কাহিনী।

২) সাধারণভাবে বৃত্ত হয় তিন রকমের। এদের নাম হল 'সরল বৃত্ত', যাতে একটাই গল্প থাকে('জটিল বৃত্ত', যাতে একটি মূল কাহিনী আর এক বা একাধিক উপকাহিনী('যৌগিক বৃত্ত',—যেখানে বেশ কয়েকটা আপাত স্বাধীন কাহিনী যারা তাৎপর্যে কিন্তু একটা অভিন্ন সংবেদন তৈরি করে।

৩) ক) না

খ) না

গ) হ্যাঁ।

উত্তর — ৫৪.৭

১) প্রথমত এটি যখন বঙ্কিমচন্দ্র রচিত একটি উপন্যাস তখন বাস্তবতা সৃষ্টি তো করতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস হিসাবে আমরা মেনে নেব কেন।

দ্বিতীয়ত, কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই পাঠকের কাছে তাকে বি(াসযোগ্য করে তোলার দরকার ছিল।

২) ক) সম্রাট আকবর।

খ) মানসিংহের ভগিনী। নাম উল্লেখ করা হয় নি।

গ) মেহের-উন্নিসা।

ঘ) ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেলিম তাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসে তার উল্লেখ নেই এই জন্য যে, উপন্যাসের সময়কালের মধ্যে তা পড়ে না

৩) ক) মোট একত্রিশটি।

খ) Comedy of Errors; King Lear; Romeo and Juliet; Macbeth; Hamlet; Othello

গ) কালিদাস — রঘুবংশম্(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্(মেঘদূতম্(কুমারসম্ভব(

শ্রীহর্ষ — রত্নাবলী।

কবীন্দ্র ভট্টাচার্য — উদ্ধবদূত।

ঘ) মধুসূদন দত্ত — মেঘনাদবধ কাব্য(বীরাঙ্গনা কাব্য(ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

দীনবন্ধু মিত্র — নবীন তপস্বিনী

বিদ্যাপতি — বৈষ(ব পদ।

ঙ) Lord Byron – Don Juan; Manfred।

John keats – Ode to a Nightingale।

W illiam W ordsworth – Laodamia।

উত্তর — ৫৪.৯

১) উপন্যাসের কাহিনী কিছু পাত্র-পাত্রীর সাহায্যেই বর্ণনা করা হয়। এই সব পাত্র-পাত্রীকেই সাধারণভাবে বলা হয় চরিত্র। তবে সৃষ্টির গুণে এই কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যদি রক্ত(মাংসের মানুষের মত সজীব না হয়ে ওঠে, তবে তাদের চরিত্র বলা যাবে না। প্রত্যেকটি মানুষের যেমন এক-একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, চরিত্রেরও তাই থাকা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে হবে দোষেগুণে ভরা মানুষ। এই ভাবেই চরিত্র আমাদের কাছে বি(াসযোগ্য হয়ে ওঠে। চরিত্র বি(াসযোগ্য না হলে কাহিনীটিও অবাস্তব মনে হবে, আর কাহিনী অবাস্তব হলে তাকে আমরা উপন্যাসই বলতে পারবো না। কাজেই উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির একটা বিরাট গু(ত্ব যেমন আছে, তেমনি কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যাতে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে, সেটা দেখাও সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব।

২) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান পু(ষ চরিত্র বলতে একটিই আছে, নবকুমার। উল্লেখ করা যায় এমন চরিত্র আছে আর দুটি—কাপালিক ও অধিকারী। এই দুটি চরিত্রই সম্পূর্ণ একমুখী, কাপালিকের সব কিছুই খারাপ এবং অধিকারীর সব কিছুই ভালো। সেইজন্য তাদের খুব বি(াসযোগ্য চরিত্র বলে মনেই হয় না। নবকুমারের চরিত্রে গুণ অনেক বেশি থাকলেও দোষও আছে কিছু। তা না হলে কপালকুণ্ডলাকে সে অবি(াসিনী ভাবতে পারতো না, কাপালিকের আজ্ঞা পালন করে কপালকুণ্ডলাকে বধের জন্য নিয়ে যেতে পারতো না — অন্তত এ কথা তার মনে পড়তো, এই কপালকুণ্ডলাই কাপালিকের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। দোষেগুণে ভরা এই চরিত্রটিই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র

হতে পেরেছে।

৩) এটা বলা একটু শক্ত, কোন সন্দেহ নেই। কারণ উপন্যাসের নাম 'কপালকুণ্ডলা'। এই চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা, একে সাহিত্যে রূপ দেবার জন্যই তিনি উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন। পক্ষান্তরে মতিবিবিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, কপালকুণ্ডলা যাতে কোন মতেই সুখী হতে না পারে, সে ব্যাপারে নিশ্চত হবার জন্য নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী হিসাবে তার পরিকল্পনা করেছেন। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যময়ী করে তুলেছেন, যেন একটা অলৌকিক পরিমণ্ডল তাকে ঘিরে আছে, তার উদাসী মূর্তির যেন সবটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মতিবিবি স্বৈরিণী নারী—ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং লুব্ধ পুরুষের বিলাসসঙ্গিনী হবার জন্যই তাকে যেন বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই নারীই আমাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আসলে মতিবিবির মধ্যে দোষের ভাগ বেশি, কিন্তু সে এক চিরন্তন নারী, এইজন্য তাকে বেশি ভালো লাগে। কপালকুণ্ডলার মধ্যে যেন এক অনির্বচনীয় মহত্ত্ব আছে, কিন্তু সে আমাদের হৃদয়ের অতো কাছে আসতে পারে না।

৪) ক) √

খ) ×

গ) ×

ঘ) ×

ঙ) √

চ) ×

উত্তর — ৫৪.১১

১) নামকরণ যখন বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তখন কপালকুণ্ডলা নামটিও তিনি নিজেই ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু নামকরণ একটি অদ্ভুত ধরনের বলেই এ প্রশ্ন উঠেছে যে এরকম নাম তিনি আগে কখনও শুনেছেন কিনা। এ বিষয়ে বলা যায়, ভবভূতির লেখা সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধবে' একটি কাপালিক ছিল, তার প্রধান শিষ্যার নাম ছিল কপালকুণ্ডলা। কিন্তু সে চরিত্রটি ছিল নির্দয় এবং হিংস্র। কাজেই, নামটি যদিওবা বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করে থাকেন ভবভূতির নাটক থেকে, চরিত্রটি তিনি নির্মাণ করেছেন নিজের মত করেই।

২) সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ আছে — কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি। একটি গ্রন্থকে ঠিক কী ধরনের বা প্রকারের সাহিত্য বলা যায়, সেটা নির্ণয় করাকেই বলে তার শ্রেণীবিচার। কারণ অনেক সময় আকৃতির দিক থেকে একরকম মনে হলেও তার প্রকৃতি হয়তো দেখা যায় অন্যরকম। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিগত বিচারটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

কপালকুণ্ডলা দৃশ্যত একটি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবেই এটি রচনা করেছেন কিন্তু অনেকেই এর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক রকম কথা বলেছেন। কেউ একে বিশুদ্ধ 'কাব্য' বলতে চেয়েছেন, কেউ বলেছেন 'নাটক', কেউ আবার এমন কথাও বলেছেন যে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিচিত্র সৃষ্টি। আর ডাব্লিউ ফ্রেজার সাহেব মন্তব্য করেছিলেন 'লতির বিয়ে', ছাড়া এমন একখানা বই নাকি পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যেও কোথাও খুঁজে

পাওয়া যাবে না। আমরা এই সমস্যার সমাধানে কীভাবে অগ্রসর হবো সেটা এই ৫৪.১১ এককে বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা আছে, আপনারা সেই আলোচনা পড়ে নিজের বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। মনে রাখবেন, সাহিত্যের প্রশ্নে একেবারে আমিই চূড়ান্ত সত্য কথা বলছি, এভাবে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং আপনার নিজের চিন্তাভাবনার সুযোগ নিশ্চয়ই আছে, তবে তা করতে হবে আপনি যেসব আলোচনা পড়েছেন, তাকেই অবলম্বন করে। কারণ আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্যই আলোচনাগুলি বিভিন্ন দিক থেকে করা হয়েছে।

৫৪.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনা নির্ভর উত্তরমালা

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার। সেটি হল, যে প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে তার প্রত্যেকটিই যাতে আপনি নিজে আলোচনা করতে পারেন, সেই ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এটা বলে দেওয়াই যথেষ্ট হতো যে, এই প্রশ্নের জন্য এই এককটি দেখে নিন এবং তারপর আপনার বুদ্ধি বিবেচনামতে ঠিক মত গ্রহণ করুন, কিন্তু বর্জন করুন, কিছু আপনি নিজে ভেবে-চিন্তে নিন। কারণ আমাদের আলোচনা একক বিভাগ করে পৃথক বিষয় নিয়েই হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী এককের বিভাগ এইরকম ঃ

৫২	লেখক, তাঁর সৃষ্টি এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
৫৩	উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণ এবং তার শ্রেণীবিভাগ।
৫৩	উপন্যাসের পথিকৃৎ কে এবং তাঁর সমসাময়িক রচনা।
৫৪.৩ ও ৫৪.৪	'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।
৫৪.৫ ও ৫৪.৬	'কপালকুণ্ডলা'র বিষয়বিন্যাস বা বৃত্তগঠনের আলোচনা।
৫৪.৭	'কপালকুণ্ডলায়' বাস্তবতা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়।
৫৪.৯	'কপালকুণ্ডলায়' চরিত্রসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য।
৫৪.১১	'কপালকুণ্ডলায়' শ্রেণীনির্ণয়।

তবুও আপনাদের সম্পূর্ণ একার প্রচেষ্টায় উত্তর লেখার অসুবিধাও কিছু আছে। প্রধান অসুবিধা হল এই যে, উত্তরগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখতে হবে—৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে। কিন্তু আমাদের আলোচনা তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত। সেই আলোচনা দেখে কী করে সংক্ষেপ করবেন তা বোঝাবার জন্য কিছু উত্তর এখানে লিখে দেওয়া হবে। তবে তা সত্ত্বেও সেই উত্তর হুবহু না লিখে আপনি নিজে কিছু ভাবুন, আলোচনা-অংশ দেখুন, তার কিছু পরিবর্তন করুন—এটাই বাঞ্ছনীয়। আপনাদের সুবিধার জন্য যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হল, সেগুলি অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।

এবার উত্তরমালা।

১) এই প্রশ্নের উত্তর আপনি অনায়াসে ৫৪.১১ অংশ থেকে করতে পারবেন। শুধু মনে রাখবেন, এই মূল কথাগুলি আপনাকে লিখতে হবে—

ক) কাব্যের গভীর অনুভূতি বর্তমান।

খ) উপন্যাসের মত স্পষ্ট নয়, রহস্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি।

গ) ভাষা একেবারেই কাব্যময়।

ঘ) কিছু উক্তি(তে কাব্যিক ব্যঞ্জনা আছে।

ঙ) কিন্তু আখ্যান চরিত্রবিত্রণ ও বিশেষ করে বৃত্তনির্মাণের বৈশিষ্ট্যে বোঝা যায় এটি কাব্য নয়।

২) এই প্রশ্নের উত্তর ১ নং প্রশ্নের উত্তরের মতই হবে, শুধু নাট্য ল(ণ বলতে কী বোঝায়, এবং সেটা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে কিনা আপনাদের বলতে হবে। তাই সেই ল(ণ দু-এক কথায় জেনে নিতে পারেন ঃ

প্রকৃতির দিক থেকে দ্বন্দ্বময়তা এবং বাহ্যিক দিক থেকে চমকিত ঘটনা সংস্থাপন নাটকের বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলায় দ্বন্দ্বময়তা আমরা খুব বেশি দেখতে পাইনা, কারণ কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব নেই। মতিবিবির যদি আগ্রার রাজসিংহাসন দখলের (মতা থাকতো তাহলে তার ফিরে আসা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারতো, কিন্তু সে সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। নবকুমার বি(ব্ধ চরিত্র—একেবারে শেষের দিকে কিছুটা দ্বন্দ্বময় বলা যায়। আসলে চমকপূর্ণ ঘটনা এখানে অনেক ঘটেছে যাদের 'নাটকীয়' ঘটনা বলতে পারি, যেমন —সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার প্রথম সা(াৎ, দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবির সঙ্গে আকস্মিক সা(াৎ, কপালকুণ্ডলার পত্র হারানো এবং তা নবকুমারের হাতে পড়া, ব্রাহ্মণ-বেশী মতিবিবির অঙ্গুরীয় দান দেখে নবকুমারের কপালকুণ্ডলাকে ভুল বোঝা ইত্যাদি।

৩) [ল(করে দেখুন, এখানে কপালকুণ্ডলা যে উপন্যাস, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি, কী জাতীয় উপন্যাস, সে কথাই জানতে চাওয়া হয়েছে।] উত্তর এই ভাবে লিখতে পারেন?

উপন্যাসের প্রধানত দুটি বিভাগ—'নভেল' এবং 'রোমান্স'। 'নভেল' আমরা পাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ এবং পরিচিত পাত্রপাত্রী, 'রোমান্সে' বাস্তবতা বজায় রেখে, আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে যে জগৎ সেখানকার মানবিক কাহিনী শোনানো হয়। 'রোমান্সের' কাহিনী ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলে তাকে বলে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং লেখকের কল্পনার যদি সেটি আগেই এসে থাকে তবে তাকে বলে 'কাব্যিক রোমান্স'।

'কপালকুণ্ডলা'র সমগ্র কাহিনী আমাদের স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে এদের আমরা পেতে পারি না, সুতরাং এটি যে 'রোমান্স' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাসের আশ্রয় এ উপন্যাসে নেওয়া হলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই বলে একে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' বলা যায় না। বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসের সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতে আগেই দেখা দিয়েছিল —যৌবনকাল পর্যন্ত লোকালয়বর্জিত স্থানে বাস করে, পরে দাম্পতয জীবনে বাস করলে কোন নারীর স্বাভাবিক সংসারাসক্তি(, প্রেম ইত্যাদি অনুভূতি জাগবে কিনা। এই চিন্তারই বাস্তব গ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ঔপন্যাসিক রূপান্তর বলা যায় এই উপন্যাসকে। কাজেই এটি যে একটি 'কাব্যিক রোমান্স' এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

৪) বুঝতেই পারছেন এর উত্তর পাওয়া যাবে ৫৪.৪ নং এককে কারণ এটি কাহিনী সংত্র(ান্ত প্র(্ন। এই এককের ৫৪.৪.১ ও ৫৪.৪.২ অংশ দেখে উত্তরটি সং(েপে লিখতে পারেন অথবা ৫৪.৪.২ অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি সরাসরি লিখে দিতে পারেন।

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের পরিচয় কিছু কিছু আমরা পাই। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ কাপালিক ও তার পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে এরকম রহস্যময় আবেষ্টনী একটা থাকতেই পারে। সেগুলির পরিচয় দিই আগে।

অলৌকিক যে অংশটি আছে সেটি রয়েছে চতুর্থ খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে। মতিবিবির সঙ্গে সা(াৎ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কপালকুণ্ডলা ভৈরবী-কালীর দর্শন পেয়েছে এবং তাঁর নির্দেশ শুনতে পেয়েছে। এটি যে প্রত্য(, সেটা দেখাবার জন্য W ordsworth-এর একটি কাব্যপংক্তি(দিয়ে পরিচ্ছেদের শু(— 'No spectre greets me — no vain shadow this,' কপালকুণ্ডলা দেখেছে 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি। গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতশ্রুতি হইতেছে, কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে — বাম করে নরকপাল — অঙ্গে (ধিরধারা ললাটে বিষমোজ্জ্বলাজ্বালা বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত।' কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি স্বপ্ন দেখেছে, তাকেও অতিপ্রাকৃত বলা যেতে পারে, কারণ সেখানে কপালকুণ্ডলার পরিণতিই যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে তরীতে কপালকুণ্ডলা ইতোপূর্বে বসন্তলীলা করেছে, সেই তরী সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবার জনয এসেছে কাপালিক, ব্রাহ্মণ বেশধারী একজন তাকে আটকেছে, তরী রাখবে না ডুবিয়ে দেবে প্র(্ন করায় তরী নিজেই তা ডুবিয়ে দিতে বলেছে এবং তরী পাতালে প্রবেশ করেছে।

সংস্কারের যে ব্যাপারটি আছে সেটি, বিবাহের পর যাত্রাকালে ভবানীর চরণ থেকে বিল্বপত্র খসে পড়া। এটি কপালকুণ্ডলাকে পরবর্তী জীবনে সর্বদা আশঙ্কিত রেখেছে।

উপন্যাস আধুনিক সাহিত্য হলেও কপালকুণ্ডলা একটু ান্য ধরনের উপন্যাস। এখানে কিছু রহস্যময়তাকে আমরা ছাড়পত্র দিতে পারি। দ্বিতীয়ত এই ধরনের অলৌকিক বা অতি প্রাকৃত যে মনের ভুল হতে পারে, তারও ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। ভৈরবী-মূর্তি দর্শনের আগে এ কথা বলেছেন মানুষের মন চঞ্চল হলে 'অনৈসর্গিক পদার্থও প্রতী(ীভূত' বলে বোধ হতে পারে। স্বপ্নদর্শন যে কপালকুণ্ডলার অবচেতন মনেরই প্রতিফলন এ আমরা বুঝি। আর সংশয় উপস্থিত হলে সংস্কার তো মানুষকে আচ্ছন্ন করেই। কাজেই কপালকুণ্ডলায় অতিপ্রাকৃত উপাদান বলে যেগুলিকে মনে হয় তাদের প্রত্যেককেই জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রত্রি(য়া বলে অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়।

৬) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা যুক্ত(করে রেখেছেন অন্ধকার এবং কপালকুণ্ডলার কেশভার — অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত। যখন প্রথম তাকে নবকুমার দেখে, তখনও তাই এবং একেবারে শেষ পরিচ্ছেদ, যেখানে কপালকুণ্ডলাকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেও তাই 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিল্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।' এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি (েত্রেই অন্ধকারই কপালকুণ্ডলার সঠিক প্রে(িত হয়েছে, শ্যামাসুন্দরী ওষধিচয়নের (েত্রেও বলেছে, 'ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়।'

চরিত্রটিতে এভাবে অন্ধকারে রাখার গূঢ় তাৎপর্য আছে বলেই আমরা মনে করি। কপালকুণ্ডলা কেবল যে বঙ্কিমচন্দ্রে কাল্পনিক সৃষ্টি তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় 'অর্ধেক কল্পনা তুমি, অর্ধেক মাধবী।' কপালকুণ্ডলা লেখকের একটি অর্ধস্ফুট তত্ত্ব পত্র — সম্ভবত লেখকের কাছেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। সেইজন্য একটি রহসের মায়াজালে চরিত্রটিকে বরাবর তিনি রেখে দিতে চেয়েছিলেন। দিনের উজ্জ্বল আলোয় এনে ফেললে সে রহস্যজাল উন্মুক্ত(হয়ে যায় বলেই প্রকাশ্য দিবালোকে চরিত্রটিকে তিনি কখনও আনেননি।

৭) প্র‍্ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি কপালকুণ্ডলার কাহিনী সংত্র(ান্ত প্র‍্ন। আপনারা জানেন এটা আমরা আলোচনা করেছি ৫৪ নং এককে। সুতরাং সেখানেই এর উত্তর আছে। আপনরা ৫৪.৩ শীর্ষাঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদটি একটু সং(পে ১০০ শব্দের মধ্যে লেখার চেষ্টা করলেই এর উত্তর হয়ে যাবে।

৮) [এই প্র‍্নের উত্তর আপনি সমস্ত আলোচনা পড়ে ঠিক যেরকম আপনার মনে হয়, সেইভাবেই দিতে চেষ্টা করবেন। আমার মতামত আমি উত্তরের মত লিখছি, এটি যুক্তি(সংগত বিবেচনা করলে আপনি এটাও ব্যবহার করতে পারেন।]

যে নারীর লোকালয়ের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না রেখে বড় হয়েছে, যৌবনে বিবাহ হলে সংসার ও দাম্পত্য জীবনকে সে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে পারবে কিনা এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে অনেক মতামত পেলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যা সংগত মনে করেছেন সেই মত অনুযায়ীই উপন্যাসে চরিত্রটির পরিণতি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া মেয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সুখী হয়নি, দাম্পত্য জীবন কাকে বলে সে বোধও তার হয়নি। এমনিতে সংসার সম্পর্কে উদাসীন সে ছিলই, তার ওপর মতিবিবির কথা জানতে পেরে সংসারে থাকার ইচ্ছা তার একেবারেই লোপ পেয়ে যায় এবং পরে নাটকীয় পরিস্থিতিতে নবকুমার তাকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটনায় দুজনেই সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

এই পরিরতি স্বাভাবিক মনে করা শক্ত(, কারণ মতিবিবি এসে আবির্ভূত হলে পরিস্থিতি কী রকম দাঁড়াতো সেটা পরের কথা, কিন্তু এক বছরের বেশি সময় নবকুমারের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে সপ্তগ্রামে কাটাবার পরও সংসারে কোনরকম আসক্তি(না জন্মানো খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। দাম্পত্য জীবন এবং যৌন জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন, তবে তাদের কোন সন্তান সম্ভাবনা ঘটেনি, এটাও আমরা দেখেছি। কপালকুণ্ডলা লোকালয়ে না থেকেও নারীসুলভ করণাবৃত্তি যখন অর্জন করেছে তখন জৈব আকর্ষণ তার কেন গড়ে উঠবেনা বোঝা শক্ত(। তাই সংসার তার উৎসাহ জন্মানোটাই স্বাভাবিক ছিল, এরপর মতিবিবির প্রসঙ্গে কোন নাটকীয় সিদ্ধান্তে লেখক নিলে সম্ভবত তা আমাদের আপত্তির কারণ হতো না।

৯) গ্রন্থের নাম 'কপালকুণ্ডলা' বলেই তাকে নায়িকা হিসাবে মেনে নিতে পারলে খুব ভাল হতো। বিশেষ করে মতিবিবি যখন কোনমতেই আদর্শনারী নয়, এমন একটি স্বৈরিণী নারীকে নায়িকার সম্মান দিলে অনেকেরেই তা ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষনীয়া নারী চরিত্র মতিবিবিই।

কপালকুণ্ডলার নাটকীয় আবির্ভাব, তার বন্য সৌন্দর্য, তার রহস্যময় চরিত্র আমাদের বিহ্বল করে সত্য,

কিন্তু তাকে যেন আমরা ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে করে নিতে পারিনা — ঠিক যেমন পারেনি নবকুমার, পারে নি শ্যামাসুন্দরী। মতিবিবিকে ঘরের মেয়ে বা আপনজন ভাবা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তাকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। আগ্রায় যে জীবনযাত্রায় সে জড়িয়ে পড়েছিল সেটা অনভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। পাঠানের হাতে লুণ্ঠিতা হয়ে যে মেয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয় তাকে নবকুমার গ্রহণ করে নি সামাজিক বিধিনিষেধের জন্যই, কিন্তু আধুনিক পাঠক হিসাবে একথা আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করি যে তাতে মতিবিবির নিজের দোষ কিছু ছিল না। এরপর (মতালোভী, বিবেকবর্জিত পিতার হাতে পড়ে যা হতে হয়েছে তাকে, তাতেও নিজের কোন হাত ছিল না তার। আগ্রার (মতার লড়াইয়ে টিকতে না পেরে এবং অবশ্যই সুপ্ত দাম্পত্যপ্রেম মনে জাগ্রত হওয়ায় যে স্ত্রীলোক সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে, তার আচরণকে আমরা নিন্দা করতে পারি, কিন্তু তার অধিকারবোধকে অস্বীকার করতে পারিনা।

তাই জীবনে অভাবিত সুযোগ পেয়ে গিয়েও যে তার অধিকারকে কোনদিন বুঝতেই শিখল না, তার বদলে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক নারীর অধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামকে — হোক না তা অসুন্দর উপায়ে, আমাদের মনে মনে সমর্থন না করে কোন উপায়ই থাকে না। মতিবিবি অবশ্যই উজ্জ্বলতর চরিত্র।

১০) চরিত্র আমরা আলোচনা করেছি ৩৭.৯ নং এককে। তাই সেখানে ৩৭.৯.৪ শীর্ষক আলোচনা সং(পে লিখতে পারেন। আমরা বৃদ্ধের চরিত্র আলোচনা করিনি, পেষমনও না(আপনি সে বিষয়েও আপনার মতামত সংযোজিত করতে পারেন।

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস তো আছেই, মুঘল ইতিহাসের একটি গু(ত্বপূর্ণ সময়ই সেখানে ধরা পড়েছে। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি কারণে একে ঐতিহাসকি উপন্যাস' আমরা বলতে পারবো না। কারণগুলি উল্লেখ করলেই আমরা এরকম সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি তা বোঝা যাবে।

ক) সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে এবং এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কেন উৎসাহিত হয়েছিলেন তা জানা থাকলে, আমরা বুঝতে পারি, মতিবিবির আগ্রার জীবনবৃত্তান্ত নয়, নির্জন সমুদ্রতীরে কাপালিকের লালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলাই এই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক কারণ এবং প্রধান আকর্ষণের বস্তু। সেই হিসাবে একে কাব্যিক রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত(করাই অধিকতর সংগত।

খ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস থেকেই চরিত্র সংগৃহীত হয়, কিছু কাল্পনিক চরিত্রও থাকতে পারে। এই উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের যোগাযোগ যেটুকু সেখানে মতিবিবি বা নবকুমার কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। ঐতিহাসিক যেসব চরিত্র অতি স্বপ-কালের জন্য উপন্যাসে এসেছে তাদের চরিত্র নির্মাণে কোন উৎসাহ লেখকের ছিল না।

গ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটা ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করতে হয়, এখানে যে পটভূমির প্রতি লেখকের উৎসাহ বেশি তাকে ভৌগোলিক বলা যায়, ঐতিহাসিক নয়।

ঘ) সমগ্র উপন্যাসের এক-চতুর্থাংশ মাত্র, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত, মতিবিবিকে আশ্রয় করেই ইতিহাস এই উপন্যাসে কিছুটা স্থান পেয়েছে — সেই চরিত্রটিও উপকাহিনীর অন্তর্গত। সুতরাং ইতিহাসের প্রে(ত এই উপন্যাসে থাকলেও একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা কখনই সংগত নয়।

একক ৩৮ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'স্ত্রীর পত্র'

গঠন

৩৮.১ উদ্দেশ্য
৩৮.২ প্রস্তাবনা
৩৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প
৩৮.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র
৩৮.৫ সারাংশ
৩৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ
৩৮.৭ অনুশীলনী
৩৮.৮ উত্তর সংকেত
৩৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৮.১ উদ্দেশ্য

প্রথম একক পাঠ করে আপনি গল্প ও ছোটগল্পের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে জেনেছেন। সেই সঙ্গে জেনেছেন ছোটগল্পের সাধারণ ল(ণগুলি। বর্তমান এককটিতে আপনি 'রবীন্দ্র' গল্প সাহিত্যের একটি স্মরণীয় রচনার সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই গল্পটির মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভাবনীয় ব্যক্তি(ত্বের, জীবন-ভাবনার এক অনন্য পরিচয় পাবেন। সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলনের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজে নারীর লাঞ্ছনার অবমাননার বি(দ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র অবলম্বনে তিনি নারীর নারীত্ব, তাঁর মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবোধকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র ছোটগল্পের সংসারে এরকম আরও কয়েকটি গল্প আছে, যার নায়িকারা বুদ্ধি, যুক্তি(, চিন্তা ও চৈতন্যে সমকালকে অতিক্র(ম করে কালাতীত মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে।

এককের মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে আপনি যে জ্ঞান আহরণ করবেন, তার সাহায্যে আপনার—

- রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য গল্পের সঙ্গে পরিচয় হবে।
- গল্পটির মাধ্যমে রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করবেন।
- উপলব্ধি করতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের যুগাতিশায়ী মনন ও মনীষার পরিচয়।
- চিঠির আকারে লেখা এই রচনাটির মাধ্যমে আপনার পরিচয় হবে গল্প-রচনার এক নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে।

৩৮.২ প্রস্তাবনা

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মনন, বিষয় ভাবনা, উপস্থাপনা ও ভাষাশৈলীর (ে ত্রে নতুন বার্তা বয়ে এনেছিল। এ পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পূর্ববর্তী 'হিতবাদী', 'সাধনা', ভারতী' যুগ থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। এ সময়ের গল্পে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার সচেতন বিচার বি(-ষণ করেছেন। নারীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা রবীন্দ্র মননকে আশ্রয় করেছে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত অনেক গল্পে তাই দেখা যায় ব্যক্তি(হিসেবে পু(ষ থেকে নারীর ব্যক্তি(ত্বই তাঁর গল্পে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। পু(ষ চরিত্র এখানে অবহেলিত না হলেও, নারী এ পর্বে অনেকটা দীপ্তিময়ী উজ্জ্বল এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রসঙ্গতঃ 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' স্মরণীয়। এসব গল্পে নারী যে শুধুই স্ত্রী নয়, তাঁরও একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি(সত্তা আছে — তা তুলে ধরা হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' পত্রাকারে লেখা 'ছোটগল্প'। বাংলা সাহিত্যে এই বিশেষ ধরনের আঙ্গিকের ব্যবহার প্রথম দেখা যায় মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। ঐ কাব্যটি ওভিদের 'হেরোইদায়' কাব্য অনুসরণে রচিত। বীরাঙ্গনা-য় নায়িকারা দীপ্তিময়ী, তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানিয়েছেন। 'সবুজ পত্রে' 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রকাশ ১৯১৪। অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। মূলগল্প পাঠের সময় বর্তমান আলোচনা গল্পের প্রতিপাদ্য বুঝতে সহায়ক হবে।

৩৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কাব্য রচনার আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায় ১৮৭৫ — চতুর্দশ বর্ষীয় বালক হিন্দুমেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। ১৮৭৭-এও আর একটি কবিতা পড়েছিলেন। এরপর নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ মনের সহজ অনুভবের একান্ততা থেকে জোরাসাঁকোর সীমাবদ্ধ জীবন থেকে যখনই বেরিয়েছেন, অনুভব করেছেন, পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতা — ত্র(মে দেশের সুবৃহৎ জনজীবনের বেদনাও তাঁর নিভৃত অন্তরে প্রবেশ লাভ করেছিল। কিন্তু তখনও কবির গ্রাম-বাংলার সঙ্গে গভীর নৈকট্য স্থাপিত হয়নি। অন্তরের এই প্রাণ-পৈতি থেকে গ্রাম-জীবন। সম্পর্কে আবাল্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এই সত্যকে স্বীকার করলেই রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্যের ত্র(মবিবর্তন সূত্রকে অনুধাবন করা যাবে। তাঁর ছোটগল্পে বস্তুত বাঙালি-জীবন মুখীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। 'ঘাটের কথা' (কার্ত্তিক, ১২৯১), রাজপথের কথা (১৩০০) ঠিক গল্প নয়। গল্পাভাস গল্পচিত্র বিশেষ। শেযোক্ত(টির কাহিনীর স্বপ্-তায় দার্শনিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলত ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি।

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' পত্রিকায় পরপর ছটি ছোটগল্প লেখেন। এখান থেকেই তাঁর যথার্থত ছোটগল্প লেখা শু(। এ সময় কবি শিলাইদা, পতিসর, নাটোর নানা জাগয়াগ নদীপথে ঘুরছেন — জমিদারী দেখার কাজে। পদ্মা-বাস পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুললেন। বাংলার গ্রাম যেন বস্তুঘন জীবনভূমিতে নেমে এলো বাংলা কথা সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বাদ্শা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি সামন্ত প্রভুরা আধা গ্রাম-শহর ছেড়ে অন্তর্হিত হলেন গ্রাম-বাংলা ও তার জনজীবন স্থান করে নিল। বাংলা গল্পের পট পরিবর্তন হোল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পর্ব চিহ্নি(ত করা যায়। প্রথম পর্বের লেখাগুলি মূলত 'হিতবাদী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। পরের পর্বটি 'সাধনা' পত্রিকাকেন্দ্রিক। তৃতীয় পর্যায়টিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সবুজপত্র'-এর যুগ(এবং শেষপর্বটি তাঁর জীবনের সায়াহ্ন(কালে আত্মপ্রকাশ করে, সমালোচক মহলে যার নাম 'তিনসঙ্গী' পর্ব। এর বাইরে 'নবজীবন', 'ভারতী', 'বালক' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম তিনটি পর্বেকে অবলম্বন করে 'গল্পগুচ্ছ' তিনখণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে। চতুর্থ পর্বের লেখাগুলির সঙ্গে 'লিপিকা', 'গল্পসল্প' এবং 'সে' গ্রন্থের কাহিনীগুলিও একত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশিত হয়। শেষ লেখাগুলি ১৯৪০ সালের 'গল্পসল্প' বইতে প্রাপ্য। 'হিতবাদী' পর্বে তিনি মূলত গ্রামজীবনকে অবলম্বন করেই লেখেন। 'সাধনা' পর্বে, তাঁর লেখায় তার সঙ্গে নগরজীবন প্রতিভাত হতে থাকে। 'সবুজপত্র'-এর আমলে মনোবি(-ষণমূলক গল্প প্রচুরায়তভাবে রচিত হয়। এবং এই ধারাটিই পুনর্বিকশিত হয়ে শেষপর্বে।

সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর গল্পে ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করেছে। জবিদারী প্রথা, পণপ্রথা, নারী-পু(ষের পারস্পরিক উপলব্ধির বহু বিচিত্রতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক টাপাপোড়েন, মনের অন্তর্বিলীন গহেনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা নানা কূটেষণা আপাত-অলৌকিকতা ইত্যাদি তাঁর লেখা গল্পগুলিতে ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে। তাঁর ছোটগল্পের শিল্পনির্মিতি এবং বিষয় গভীরতার জন্য, বি(ের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের সঙ্গে তাঁকে নির্দ্বিধায় একাসনস্থিত করা যেতে পারে।

৩৮.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু,

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি — মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি(চিঠি লেখাবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রী(ত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাছে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই(সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে(তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল(তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদী(রের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজো বউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর র(া পেত?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স

বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না — সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না — তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়ে-মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল — আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল — তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখান তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের

আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ, উপবাসী গো(গুলো তত(ণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে — তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গো(এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম(যখন বুড়ো হলুম তখন গো(র প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা ল(্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত(তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বি(-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তি(টুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্ত(ার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত(হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ(সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে(হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে(উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না(দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অ(য় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্ত(ার একটা ভুল করেছিল(সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো — অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো(আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত(করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উটে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়(আমাদের প(ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো (ণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গো(বাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে(শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল(তারপর থেকে ফাটল শু(হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পর আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো — দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া সে কতবড়ো অপমান। দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তারপরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না — রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সলক দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় — তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিয়ে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেঝেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা

অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জোর নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জোর হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না — মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি — এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুত্ত(স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামার লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত — তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এইসকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলেন যে, আমার হাতখরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে অথচ তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তি(তে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, 'বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ র(া করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে(তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল(বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, "বিন্দু, তুই ভয় করিস নে — শুনেছি, তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপ(রা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে — কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, ''দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।''

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, ''দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।''

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, ''জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি(সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।''

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই — বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

অআমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই — সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন — আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে (মা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ''দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?''

আমি বললুম, ''না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করবে না।''

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম(তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

'সত্যি বলছিস, বিন্দি?''

''এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। (শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না — কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।''

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুস দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পু(ষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি(বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালার ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে-রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমার বললে, "বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।"

আমি বললুম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বললুম, "আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দুর (শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললুম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বললুম, "আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর (শ্বশুরবাড়ির থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে — কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গো(প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, "তা দিক্ থানায় খবর!"

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলেছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল(জগতের মধ্যে অধমতম কাপু(ষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পু(ষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছে, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেলে কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল(তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার যে এফ. এ. পরী(ায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ"।

আমি বললুম, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম — কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে — কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, ‘‘বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, ‘‘আমিও যাব।’’

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারের সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, ‘‘যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।’’

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, ‘‘ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব — ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।’’

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুখ দমে গেল। আমি বললুম, ‘‘কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?’’

সে বললে, ‘‘না।’’

আমি বললুম, ‘‘রাজি করতে পারলি নে?’’

সে বললে, ‘‘আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।’’

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, ‘‘মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।’’

তোমরা বললে, ‘‘এ সমস্ত নাটক করা।’’ তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে। যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি — মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনের মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হবে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিনি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা

অসচ্ছল নয়(তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হয় তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে — আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ — সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই আন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার — কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত — আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল — কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া(কোন্ দুঃখ কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলেন। (ণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই অত্তবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি — ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল — তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু — তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন —

মৃণাল

শ্রাবণ ১৩২১

৩৮.৫ সারাংশ

স্ত্রীর পত্র' গল্পের উপস্থাপনায় সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির বাড়ীর মেজ বৌ মৃণাল পিস্ শাশুড়ীর সঙ্গে শ্রী(ত্র গিয়ে তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখছে।

বিয়ের পনেরো বছর পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে জগত এবং জগদী(রের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ জানতে পেরেছে - এ সংবাদ স্বামীকে জানিয়েছে।

মৃণাল দুর্গম পাড়া গাঁয়ের মেয়ে। বৌ — মেজবৌ হয়ে এসেছে কলকাতার ইট কাঠের চার দেওয়ালের অন্দরমহলে। এ বাড়ীর বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার, অসতর্ক বিধাতা মেজেবৌকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি বুদ্ধি দিয়েছেন শুধু নয়, সেই সঙ্গে তাঁর ছিল কবিতা লেখার (মতা।

কোলকাতার বনেদি বাড়ীর আভিজাত্য — বাড়ীর সদরের বাগান, ঘরের সাজসজ্জা — আসবাবের অভাব নেই(কিন্তু অন্দরটি ছিল তার উল্‌টো — সেখানে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। আলো জ্বলে মিট্‌মিট্ করে। হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে। উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না, দেওয়াল, মেঝের কলঙ্ক অ(য় হয়ে বিরাজ করে। এখানে মেয়ে-মানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে নিয়ম।

এ বাড়ীর আতুড়ঘরে মেজবৌয়ের মেয়েটি জন্ম নিয়ে মারা গেল। মায়েরও ডাক এসেছিল। ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে সন্ধ্যা তারার মত (ণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল — মা হবার দুঃখটুকু পেলেও মা হবার মুক্তি(টুকু পেলে না। মেজ বৌ থেকে মা হয়ে সংসারে থেকেও বি(সংসারের হয়ে উঠতে পারলে না।

মেজবৌ সংসারের নিত্য কর্মে আবার জড়িয়ে পড়ে। বড় জায়ের বোন বিন্দু সংকটে পড়ে দিদির কাছে আশ্রয় নেয়। বাড়ীর লোকেরা ভাবলে এ আবার কোন আপদ। মেজবৌ সমস্ত মন, সমবেদনা নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বড়বৌ বিন্দুকে সাংসারিক কাজে নিযুক্ত(করে খাওয়া পড়ার যৎসামান্য ব্যবস্থা করলেন। বড়জা'র সংকট ও বিন্দুর দুরবস্থা দেখে মেজবৌর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে — সে শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাবোধ করে — বিন্দুকে নিজের ঘরে টেনে নেয়। বিন্দু ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেল। স্নেহস্পর্শে বুঝল তার আশ্রয়কে। বিন্দুর ভয় ভাঙল। সে মেজবৌকে এমন গভীরভাবে ভালবাসলে যেন পাগল হয়ে উঠল। প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া যখন লাগল, বিন্দুর অনাদৃত চিত্তও যে আগাগোড়া রঙিন হয়ে উঠল(মেজবৌও তখন হৃদয়ে অনুভব করলে, জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে। এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে

মেজবৌ তার নিজের স্বরূপকে দেখেছে — আবিষ্কার করেছে জীবনের মুক্ত(রূপ।

বিন্দুকে নিয়ে প্রতিকূলতার সীমা ছিল না। কিন্তু সব বাধা অস্বীকার করে বিন্দুর আনুকূল্য করায়, তাঁর হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অবশেষে, বিন্দুর বয়স বেড়ে যাওয়ার বিব্রত হয়ে তাকে বিদায় করবার উপায় তৈরী হোল। বিন্দুর বর ঠিক হোল। বিয়ের পর জানা গেল সে পাগল। বিন্দুর শাশুড়িও পাগল। বিন্দু পালিয়ে এসে, গোপনে এ বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। পরে এ বাড়ীর সংকট এড়াতে সে (ধশুরবাড়ী চলে যায়। সেখানে, শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

বিন্দুর এমনই পোড়া কপাল সে বেঁচে থেকেও রূপ-গুণের জন্য কোন যশ পায় নি। মরে গিয়েও লোকেদের চটিয়ে দিলে। মেজবৌ মৃণাল বলেছে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে খাওয়া পরায় অস্বচ্ছলতা ছিল না, কারও বি(দ্ধে সেরকম কোন নালিশ না থাকলেও এটা বোঝা গেছে এ বাড়ীতে মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। কিন্তু বিন্দু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সে তার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়ো। বিন্দুর এই মৃত্যুতে মৃণাল নতুনতর সত্যকে আবিষ্কার করেছে, অভ্যাসের অন্ধকার এতদিন তাকে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দু তার মৃত্যু দিয়ে সেই আবরণ আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়েছে — মেজবৌ মরেছে, মৃণালের সামনে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তাঁর শেষ কথা — আমি বাঁচব, আমি বাঁচলুম। মীরাবাঈকে বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি।

৩৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছিলেন 'সবুজপত্র'-এর ১৩২১ সনের শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি চলিতভাষায় লেখা তাঁর প্রথম গল্প। এদিক থেকে বিচার করলেও, এই গল্পের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শুধু বিষয়বস্তুই নয়, প্রকাশ মাধ্যমের ব্যাপারেও এর অভিনবত্ব ল(ণীয়। চলতি ভাষায় লেখা একটি ব্যক্তি(গত চিঠির আয়তনে রচিত এই গল্পের মাধ্যমে নারীর আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা সোচ্চার হয়েছে, তাকে আমাদের সামাজিক পরিপ্রে(িতে একান্তভাবে উল্লেখনীয় বলেই মানতে হবে। যেদেশে নারীত্বের আদর্শ হিসেবে সর্বদাই শেখানো হয়েছে যে, স্ত্রী হবে স্বামীর ''ছায়া ইব অনুগতা'' সেখানে স্বামী ও (ধশুরবাড়ির আর সকলের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এবং নিজের সেই উপলব্ধিকে বাঙ্ময় করে তোলার এমন নজির গত শতাব্দীর প্রথমদিকের পরিপ্রে(িতে ছিল নেহাৎই অকল্পনীয়। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সূত্রে নারীর স্বপ্রতিষ্ঠ হবার, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করার অনাগত কালকেই যেন পূর্বঘোষিত করতে চেয়েছেন।

অবশ্য সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিবাদিনী নারী এই গল্পের নায়িকা মৃণালই একা নয়। তার মতোই 'মানভঞ্জন'-এর গিরিবালা কিংবা 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা উপে(া, অপমান ও অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীকে ত্যাগ করেছে। এদের তিনজনের মধ্যে যে ভাবগত মিলটা আছে, তা হল এরা প্রত্যেকেই স্বামীগৃহের র(ণশীল, পুরোনোপন্থী আর্থ-সামাজিক মূলবোধকে বর্জনীয় বলে উপলব্ধি করেছে এবং তার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে নিজের পায়ের তলার জমি নিজেই খুঁজে নেবার অভীপ্সায়।

এই ধরনের আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী আরও যেসব নারীকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে আমরা দেখি (যেমন ঃ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী('গোরা'-র

ললিতা('চতুরঙ্গ'-এর দামিনী, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী(কাহিনী-কাব্য 'নিষ্কৃতি'-র মঞ্জুলিকা এবং 'অমৃত'-র অমিয়া) তাদের সঙ্গে মৃণাল এবং অনিলা-গিরিবালার পার্থক্য আছে। তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের দীপ্র ঘোষণায় মুখর ঠিকই কিন্তু এই তিনজনের মতন সামাজিক-পারিবারিক (ে ত্রে র(ণশীল মেল-শ্যভিনিজ্‌মকে ধিক্কার দিয়ে বিদ্রোহ করেনি। মৃণালের বিদ্রোহ আবার এই তিনজনের মধ্যে তীব্রতর — কেননা, সে তার চিঠির মাধ্যমে (শ্বশুরবাড়ির সমস্ত পরিবারটাকেই যেন ন্যায়-নীতির কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মৃণাল যেভাবে তার স্বামীকে সম্বোধন করে চিঠি শেষ করেছে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল'') তার সঙ্গে তার প্রারম্ভিক সম্বোধনটির (''শ্রীচরণকমলেষু'') তুলনা করলেই বোঝা যায় যে, এই কাহিনীর মধ্যে কীভাবে তার জীবনাদশটি বাঙ্ময় ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। তার যে-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য, সেটি তো এদেশের পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোদের প্রে(িতে নারীর মর্যাদাবোধ ও ন্যায়সঙ্গত পারিবারিক-সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ আত্মসমী(া। সমাজ বাস্তবতার এই গভীর উপলব্ধির স্তরটির সঙ্গে সংযুক্ত(হয়েছে একটি প্রত্য(-বহিরঙ্গের কাহিনী, যা গড়ে উঠেছে বিন্দুর জীবনের ক(ণ ট্র্যাজেডির অনুষঙ্গে।

ধনীগৃহে আশ্রিতা আত্মীয়কন্যার প্রতি সমগ্র পরিবারের উপে(া এবং হৃদয়হীনতার কাহিনী অবশ্য সেযুগের বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল ছিল না। কিন্তু বিন্দুর জীবনে বিবাহ নামক 'দুর্ঘটনাটি' সাংসারিক সীমানাকে অতিত্র(ম করে একটা সামাজিক ভ্রষ্টতার বিধানকেই স্পষ্টচিহ্নে(সূচিত করে তুলেছে। আর তার উপলে(ই মৃণাল বিদ্রোহ করেছে নিজের (শ্বশুরবাড়ির বি(দ্ধে। বস্তুত, তার ঐ বিদ্রোহ আসলে চিরাভ্যস্ত সামাজিক-বিধিবিধানের অপহ(বী চরিত্রের বি(দ্ধেই — এমন বললেও ভুল হবে না।

বিন্দুর বিয়ে এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর সূত্রে যে-অমানবিক হৃদয়হীনতার উদ্‌ঘাটন ঘটেছে এই গল্পে, তা আমাদের সমাজে খুবই পরিচিত, সুলভ(হয়ত আজও। বিন্দুর ট্র্যাজেডিকে হয়ত আমরা ব্যক্তি(গত বেদনার কাহিনী হিসেবেই গণ্য করতাম, যদি-না মৃণালের জবানিতে সেটার অন্তর্বী(ণ করতে বাধ্য হতাম আমরা, এই গল্পের পাঠকরা, যদি না তার 'চোখে' আমরা সমস্ত ঘটনাগুলিকে প্রত্য(করতাম(যদি এই ব্যক্তি(গত চিঠিকে ন্যায়নীতির এজলাসে দাঁড়ানো আসামীরূপে ভ্রান্ত সামাজিক-মূল্যবোধের উদ্দেশে তর্জনী তোলা একটি অভিযোগপত্র বলে না অনুভব করতাম আমরা।

।।২।।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে উদ্দিষ্ট স্বামীট নামহীন(সেটা আমাদের তৎকালীন দেশাচার হিসেবে খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এর একটি প্রতীকী তাৎপর্যও আছে। মৃণালের এই 'নামহীন' স্বামীটি প্রকৃতপ(আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা 'স্বামী-সাধারণের' প্রতিনিধি। তাই গল্পের শু(তে মৃণালের সম্বোধনে সে, একা (তাই, ''শ্রীচরণকমলেষু'')(কিন্তু কাহিনীর শেষে সে, গোটা পরিবারের (হয়ত সমগ্র সমাজবিধানের বাহকদেরই) প্রতিনিধি। আর সেই কারণেই সম্বোধনটা রূপান্তরিত হয়েছে বহুবচনে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'')। এই বহুবাচনিক উক্তি(টি তাই সমগ্র পু(ষ-শাসিত সমাজবিধিবাহকদের উদ্দেশেই যে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না আদৌ।

'শ্রীচরণকমলেষুর' আশ্রয় থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে মৃণাল নিজের স্বাধীন সত্তাকে উন্মুক্ত(করতে

প্রয়াসী হয়েছে। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে (শ্বশুরবাড়ির সদর দরজার ওপারে সে পা বাড়ায়নি(তাই স্বামীকে চিঠি লেখারও কোনও উপল(তার ঘটেনি (বা, জোটেনি)। কিন্তু সেই অতিপরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মাঝেই যে-সুপ্রবল এক অপরিচয় লুকিয়েছিল, তাই প্রমাণিত হয়েছে মৃণালের এই চিঠিতে। (শ্বশুরবাড়ির ঐ দম-আটকানো পরিবেশেও (যাকে রবীন্দ্রনাথেরই 'মুক্তি(' কবিতার একটি পংক্তি(উদ্ধৃতির সূত্রে বলতে পারি ''রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'') তার স্বকীয় অস্তিত্বের বোধটাকে নির্মূল করে তুলতে পারেনি। ঘরকন্নার বাইরে মৃণালের সঙ্গোপন আত্মিক মুক্তি(কবিতা লেখায়। সেখানে কোনও পারিবারিক বা সামাজিক অনুশাসনের প্রাকারই তার একান্ত-নিজের অস্তিত্ববোধটাকে বন্দী করে রাখতে স(ম হয়নি। কিন্তু তার এই কবিতা লেখার কথাটা পনেরো বছরের মধ্যে কেউই — এমনকী তার স্বামীও জানতে পারেনি। মৃণালের সৃষ্টির আবেগের অংশ নিতে পারেনি সে। সেই অপরিচয়ের ব্যবধানটুকু দেড় দশক ধরে উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে দুজনের মধ্যে — সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুও তাদের সেই বিচ্ছিন্নতাকে একই অনুভবের অংশীদার করতে পারেনি। মৃণাল যে শিশুটির মা হয়ে 'মাতৃত্বের যন্ত্রণাটুকু' পেয়েছিল, কিন্তু 'মাতৃত্বের মুক্তি(টুকু' পায়নি — সেই 'মেয়েসন্তান'-টির মৃত্যুরও কারণ ছিল তাদের পারিবারিক-সংস্কারাচ্ছন্নতাই। আঁতুড়ঘরের অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক থেকে বার হয়ে শোবার ঘরের সুস্থ পরিবেশে সে ঢুকতে পায়নি। মৃণালের নিজেরও তখন মুমূর্ষু অবস্থা ঃ ''আগলা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে'', যম ঠিক মতো টান মারলে সেদিন 'শিকড়সুদ্ধ' সেও উপড়ে যেতো। এই 'আলগা ঘাসের চাপড়া' চিত্রকল্পটি তো আসলে মৃণালের নিজেরই প্রতীক ঃ তাই তার 'বিচারবুদ্ধি' (যম নয়!) যখন তাকে টান মেরেছে, সে-ও ঐ ভাবেই সংসারের জমিনের থেকে হয়ে গেছে শিকড়সমেত উন্মুলিত। বিন্দুর প্রতি ঐ ২৭নং মাখন বড়ালের গলির অন্য সমস্ত বাসিন্দাদের হৃদয়হীনতা সেই বিচারবুদ্ধির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। বিন্দুর আত্মহননে তা চূড়ান্ত হয়ে গেল।

বিন্দু যখন ২৭নং বাড়িতে আশ্রয়ভিখারী হয়ে এসেছে, তখন সারা পরিবারের (মায়, তার আপন দিদিরও!) বিরক্তি(, গঞ্জনার বিপরীতে একমাত্র মৃণালই তাকে স্নেহ এবং মমতা দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে। অসুস্থ সেই কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে সেই আঁতুড়ঘরেরই (যেখানে তার সদ্যোজাত কন্যাটি মারা যায়) এককোণে আশ্রয় নেওয়াটা তার বুভু(মাতৃসত্তারই এক অল(্য আত্মপ্রকাশ। তার মরে যাওয়া ঐ মেয়েটিকেই সে যেন ঐ ঘুপচি আঁতুড়ঘরের অন্ধকারে ফিরে পেল বালিকা বিন্দুর মধ্যে। এবং ঠিক এই কারণেই বিন্দুর প্রতি অবিচারগুলো মৃণালের মনের গভীরে বিম্বিত হয়েছে তার নিজের মৃতা মেয়েটির প্রতি অবিচার হিসেবেই — যে জন্মের কদিন পরেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার 'আপনজন'দের (!) অবিমৃষ্যকারী সংস্কারাচ্ছন্নতার পরিণামে (ইংরেজ ডাক্ত(ারের তিরস্কারের কথাটা এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য অবশ্যই) । তাই পরবর্তীকালে বিন্দুর মর্মান্তিক মৃত্যু (প্রকৃতপ(যার জন্যে দায়ী মৃণালের (শ্বশুড়বাড়ির লোকজনই) নতুন করে তার নিজের কন্যাবিয়োগের স্মৃতিকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলল(এবং সেটাই মৃণালের এতবড় গু(তর সিদ্ধান্ত নেবার পথটাকে খুলে দিল একবারে। গায়ে আগুণ ধরিয়ে বিন্দুর আত্মহননকে মৃণাল পারিবারিক-সামাজিক অনুশাসনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ হিসেবে গণ্য করেনি(তার কাছে সেটা প্রতীত হয়েছিল সমস্ত নির্যাতিতা নারীর হয়ে এক প্রজ্জ্বলন্ত প্রতিবাদের প্রবল প্রতীক হিসেবেই, সেই প্রতিবাদের অনল-আলোকে মৃণাল নিজের মনেরও সকলটুকুকে পুরোপুরি দেখতে পেয়েছিল, আর পরিণামে তার নিজের প্রতিবাদের মশালও সে যেন ঐ 'আগুনেই' জ্বালিয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মৃণাল, স্বামীকে ছেড়ে আসার এই দলিলে মীরাবাইয়ের কথা উল্লেখ করেছে। মহারাণী মীরার সঙ্গে মেবার রাজপরিবারের দ্বন্দ্বটাও ছিল আদর্শগত, যদিও তা একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। মৃণাল নিজে কবিতা লিখত(তাই সে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কথাটাও স্মরণ করতে পারত হয়ত। বা জাহ(বী কর্তৃক শান্তনুকে পরিত্যাগ করে যাবার কথাটা তার মতো মেয়ের জানা থাকাই স্বাভাবিক। তবে মৃণালের এইভাবে স্বামীকে ছেড়ে যাবার অন্তরালে কোনও আধ্যাত্মিক, কিংবা পৌরাণিক প্ররোচনা নেই। চিরকাল এদেশে 'পতিদেবতারাই' স্ত্রীদেব পরিত্যাগ করে এসেছেন — এখানে ঘটল তার ঠিক বিপরীত ব্যাপারটাই। এ(ত্রে অবশ্য মৃণালই প্রথমা নয়('কৃষ(কান্তের উইল' — এর ভ্রমর তার পূর্বসূরিকা। কিন্তু মৃণালই সর্বপ্রথম স্বামীকে উপল(করে সমগ্র সমাজবিধানটাকেই আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছে। ভ্রমরের মতো স্বামীর ব্যভিজারের জন্য নয়, গোটা পরিবারের এবং সমাজের অনাচারের শরিক হবার কারণেই মৃণাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। খাওয়া-পরার অস্বচ্ছল দুঃখ তার ছিল না স্বামীর সংসারে, ছিল না স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কোনও অপ্রতুলতা। তার স্বামীর নৈতিক চরিত্রও ছিল অকলঙ্ক। তবু মৃণাল স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার নারীত্ব, তার মাতৃত্ব, তার মনুষ্যত্ব এবং আত্মস্বতন্ত্র সম্মানের বোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে প্রণোদিত করেছে এতবড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। ২৭ নং মদন বড়ালের গলির পাঁচিলবন্দী পনেরো বছরের জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ে সে ঠাঁই নিয়েছিল মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত(উপকূলে — পুরীধামে। এটিও একভাবে প্রতীকী ব্যঞ্জনাবহ বৈ কি! মীরাবাই, কি ভ্রমর, বা গিরিবালা, কিংবা জাহ(বী, অথবা অনিলার স্বামী-সংসার ত্যাগের সঙ্গে এই জন্যে মৃণালের সব ছেড়ে চলে যাওয়াটা মেলে না। এমন কী, এই গল্পের সমসাময়িক 'বোষ্টমী' গল্পের নায়িকাও স্বামী ছেড়ে চাওয়ার সঙ্গে এর গরমিল! বোষ্টমী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় স্বামীর অনুমতি নিয়েই — বৃহত্তর এক হৃদয়াবেগের আকুতিতে আকূল হয়েই। মৃণালের বেলায় তো তা হয়নি!

৪৩৪

হেনরিক ইবসেনের 'এ ডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গেও মৃণালের তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশের সমালোচক মহলে রয়েছে। নোরার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিল, সে তার স্বামীর খেলার পুতুল হয়ে থাকতে চায়নি বলে। সেও যে পরিপূর্ণ ব্যক্তি(ত্বসম্পন্ন একটি নারী, একজন মানুষ - একথা তার স্বামী উপলব্ধি না করে, তাকে আদরে-আ(াদে, পোশাকে-গয়নায়, উচ্ছ্বাসে-উৎসাহে নিজের একটি জীবন্ত খেলনা হিসেবে দেখতেই ব্যতিব্যস্ত ছিল! এর বি(দ্ধেই নোরার প্রতিবাদ এবং শেষ দৃশ্যে সজোরে সদর দরজা বন্ধ করে স্বামীর ঘর থেকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘটনাটা তারই দ্যোতনাবাহী। নোরার ঐ আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা - নারীর মানবিক মুক্তি(র এক ধরনের অভিপ্রকাশ(আর মৃণালের এই বিদায়, আর একভাবে, আর এক পরিপ্রে(িতে সেই নারীরই মুক্তি(ঘোষণার প্রয়াস।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি যতই সামাজিক তাৎপর্যময় হোক না কেন, তার কয়েকটি দুর্বলতার কথাও কিন্তু উল্লেখ না করে আলোচনা শেষ করা যায় না। এই গল্প, 'একটি' নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে যতখানি দামী, ততখানি শিল্পঋদ্ধ নয়। মৃণালের চরিত্রও যতটা দীপ্র এবং বলিষ্ঠ, ততটা সূক্ষ্ম জটিল অনুভবে উদ্বেল হয়নি। তার মগ্নচৈতন্যের গভীরে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে-পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের যে টানাপোড়েন প্রত্যাশিত ছিল, তা কোনও প্রতিভাস এতে ব্যঞ্জিত হয় নি, কোনও সময়েই না। বিন্দুকে উপল(করে তার যে নিজস্ব আবেগ ত্রি(য়াশীল ছিল — সেটাও ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে মিশে গেছে। নিজের রূপ এবং বুদ্ধি এবং কবিত্ব — এই সব নিয়ে একটা অনুচ্চারিত অহম্‌বোধও তার সঙ্গে জড়িয়ে

ছিল। বৃহত্তর সামাজিক জটিলতার দিকে তার চিঠির মাধ্যমে পাঠকের দৃস্টি পড়ে ঠিকই, কিন্তু মূলত সেটা ২৭নং মদন বড়ালের গলির বাসিন্দা একটি পরিবারের সেজ বউয়ের 'পার্সনাল টেস্টামেন্ট' হিসেবেই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

এই একক প্রতিবাদ অনাগত সামাজিক বিপ-বের পূর্বপ্রতিভা হিসেবে কতখানি গণ্য হয়েছে বা হতে পারে, সেই নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সবটুকু মিলিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন ভাবনার মুক্তি(ঘটালেন যে আমাদের কথা কথাসাহিত্যে, সে কথা অনস্বীকার্য।

৩৮.৭ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণাপত্র বলা যায় কি-না বি(-ষণ কর।

২) 'স্ত্রীর পত্র' অবলম্বনে ১৯শ শতকের শেষভাগে / ২০শ শতকের গোড়ায় কলকাতার বনেদী গৃহস্থ পরিবারগুলির একটি লেখচিত্র রচনা কর।

৩) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের চিঠির শেষে মৃণালের যে উক্তি(, ''আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।''— এর তাৎপর্য কী বি(-ষণ করে দেখাও।

খ) সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে চিঠির শু(তে মৃণাল স্বামীর উদ্দেশে লিখেছে, ''শ্রীচরণকমলেষু'' এবং সব শেষে লিখেছে, ''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'' — এই পার্থক্যের কারণ কোথায় নিহিত?

২) 'আডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গে এবং মেবারের মহারাণী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে মৃণালের পার্থক্য কোথায়?

৩) 'মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।'' — এটা কার উক্তি(? এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি?

৪) ইংরেজ ডাক্ত(ার কেন এসেছিলেন বিন্দুদের বাড়িতে? তিনি কী করেছিলেন? কেন?

৫) ''তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে।'' — একথা নিহিতার্থ কী?

৬) স্বামী-সংসার ছেড়ে মৃণাল শ্রী(ে ত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন?

৭) ''ঘাসের চাপড়া'' কথাটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে কোন্ তাৎপর্য বহন করে?

গ) সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) বিন্দুর সঙ্গে মৃণালের পারিবারিক এবং মানসিক সম্পর্ক দুটি কী কী?

২) ''ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা'' মৃণালের গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকার করতে লাগলেন কেন?

৩) মৃণালের (ᐁশুরবাড়ির ঠিকানা কী?

৪) শরৎ কে? সে কী খবর এনেছিল?

৫) মৃণাল শরতের কাছে ''লোক দিয়ে'' কী পাঠিয়ে দিত?

৬) বিন্দু (ᐁশুরবাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

৭) বিন্দুর পাগল স্বামী তাকে কে বলে ভাবত?

৮) শরৎ কোন্ পরী(ায় ফেল করেছিল? কেন?

৯) মৃণালের বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে ক-জন গিয়েছিল?

১০) মৃণাল বসন্তের আগমনী-সংকেত কীভাবে পেত?

৩৮.৮ উত্তর সংকেত

বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১) প্রাথমিক আলোচনার প্রথম অংশটি ল(্য ক(ন। এরপর মূলপত্রের উত্তর ক(ন।

২) গল্পে বর্ণিত মৃণালের বাড়ীর পরিবেশ ও সং(-ষ্ট পারিবারিক চিত্র সং(েপে লিখুন।

৩) মৃণাল স্বামী গৃহের র(ণশীল, পুরনোপন্থী, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা পীড়িত বোধ করেছে। তার থেকে মুক্তি(পেতে চেয়েছে। উক্তি(টির মধ্যে তা-ই ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে যথাযথ উত্তর করতে সচেষ্ট হোন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর ক(ন।

২) প্রাথমিক আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর ক(ন।

৩) উক্তি(টি বিন্দুর দিদির। মেজবৌ মৃণালের বড়জা-র। মৃণাল বিন্দুকে স্নেহাশ্রয় দেওয়ায় বড়বৌ বলে মনে খুশী হলেন এবং বাড়ীর অন্যান্যদের অনুযোগ থেকে বেঁচে গেলেন। তিনি তাঁর ছোট বোন বিন্দুকে ভালবাসলেও নিজে সেই স্নেহ দেখাতে পারতেন না। মেজ-বৌ সস্নেহে তাকে গ্রহণ করায় তাঁর মনটা হাল্কা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করার শক্তি(তার ছিল না বলে, উদ্ধত মন্তব্য করেছিলেন। বাইরে তাই এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরী করতে লাগলেন যে এজন্য তিনি দায়ী নন।

৪) বিন্দুর মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। বিন্দুর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হলে ইংরেজ ডাক্ত(ার ডাকা হয়। তিনি অন্দর দেখে আশ্চর্য হলেও আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত(হয়ে বকাবকি করেছিলেন। কেননা সেখানে

আলো জ্বলে মিটমিট করে। হাওয়ায় চোরের মত ঢোকে, উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না। দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অ(য় হয়ে বিরাজ করে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কারও যেন লজ্জা বা দুঃখবোধ ছিল না।

৫) মেজবৌ মৃণালের ব্যক্তি(ত্বের স্বরূপ বি(-ষণ করে উত্তর দিন।

৬) বিন্দুর মৃত্যুর পর মেজবৌ মৃণালের মনে নতুন ভাবোদয় হয়। ২৭ নম্বর বাড়ীর মধ্যেকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অন্দর মহলের তুচ্ছ ইট কাঠের আড়ালে টিকে থাকার চেয়ে বাড়ীর চৌকাঠ পেরিয়ে মেজবৌ-এর খোলস ছিন্ন করে বি(জগতের ছয় ঋতুর সুধাপাত্রে ভরা আনন্দলো যাত্রার উদ্দেশ্যে শ্রী(ত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

৭) মূলপাঠ পড়ে সং(প্ত উত্তর লিখুন।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখন মূলক প্রশ্ন ঃ

আলোচনা নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠ পড়লেই সঠিক উত্তরের সন্ধান পাবেন / উত্তর লিখুন।

৩৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *গল্পগুচ্ছ* (৩য় খণ্ড)

২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*

৩) প্রমথনাথ বিশী — *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*

৪) শিশির কুমার দাস — *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩ - ১৯২৩)

৫) (ত্র গুপ্ত — *রবীন্দ্রগল্প ঃ* অন্য রবীন্দ্রনাথ

৬) তপোব্রত ঘোষ — *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*

৭) ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার।*

একক ৩৯ ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুঁইমাচা

গঠন

৩৯.১ উদ্দেশ্য

৩৯.২ প্রস্তাবনা

৩৯.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৩৯.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

৩৯.৫ সারাংশ

৩৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৩৯.৭ অনুশীলনী

৩৯.৮ উত্তরমালা

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৯.১ উদ্দেশ্য

'পুঁইমাচা' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হয় — ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। এ সময়েই 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভা (১৩৩০)। কল্লোলের উত্তাল, উচ্চ কণ্ঠ যোদ্ধবেশ বাংলা সাহিত্যের জগতকে যখন হতচকিত করে দিয়েছে, সেই সময় বিভূতিভূষণ মনে হয়, অনেকটা সচেতনভাবেই নীরব প্রতিবাদী ভঙ্গীতে তাঁর নিজের কথা বলতে শু(করেছেন। কল্লোলের লেখকরা যখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী হতে ব্যাকুল, উৎসুক, বিদ্রোহের নামে প্রতিত্রি(য়া প্রকাশে কিছুটা উদ্ধত, বিভূতিভূষণ তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তি(ত্বের বর্মে নিজেকে ঢেকে রেখে নীরবে পল্লীবাসী, সহায় সম্বলহীন মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের জীবনকথা বলে চলেছেন। পুঁইমাচার ৫(ন্তি, সহায়হরি চাটুজ্জে, অন্নপূর্ণা চরিত্রকে বাংলার গ্রাম থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।

এ এই গ্রামবাংলাকে আশ্রয় করেই বারবার এসেছে বাংলার প্রকৃতি — পল্লীগ্রামের নানা গাছপাল, পাখ-পাখালি, তাঁর নানা পালা-পার্বন। এমনকি লোকচার ও লোক সংস্কার। তিনি গ্রামজীবনের 'সাগা' (Saga) রচনা করেছেন। শহুরে মধ্যবিত্তের পেছনে ফেলে আসা সেই গ্রামের চরিত্রচিত্রশালায় 'নস্টালজিয়া' অনুভব করেছেন। ফলে তিনি বাঙালি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছেন।

পুঁইমাচা গল্পটি পাঠ করে আপনিও তাই ব্যক্তি(গতভাবে উপলব্ধি করবেন —

১) গল্পের নায়িকা ৫(ন্তির লাগান পুঁই গাছ-এর মাচা গল্পের শেষ পরিণতিকে নূতন মাত্রা এনে দিয়েছে।

২) গ্রাম বাংলা ও তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ ও পরিবার জীবনের লেখক একটি জীবন্ত ছবি এ গল্পে এঁকেছেন।

৩) গল্পের পরিবেশ বর্ণনায় প্রকৃতির এমন একটি শান্ত, সরল, সহজ-সুন্দর লাবণ্যময় রূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা গল্পের রসকেন্দ্রটি ব্যঞ্জনায় লেখকের প্রকৃতি-ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে।

৪) গল্পের শেষ পরিণতি থেকে প্রকৃতি-প্রেমিক লেখকের রোমান্টিক করিপ্রাণতার পরিচয় পাবেন।

৫) পুঁইমাচার রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্য তার নায়িকা (্ষন্তির মত নিরলঙ্কার। আর স্বভাবে সহজ ও সরল অথচ অনুভব-সংবেদনাময় ও গভীর। এ ভাষা বিষাদঘন মুহূর্ত রচনার প(্ষ যথেষ্ট বলবান — এ উপলব্ধিও ঘটবে।

৩৯.২ প্রস্তাবনা

'পুঁইমাচা' গল্পটি প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস রচনার সূত্রপাত বৈশাখ, ১৩৩২। এদিক থেকে 'পুঁইমাচা' ও 'পথের পাঁচালী' সমসাময়িক কালের রচনা। এই দুটি রচনাতেই গ্রাম বাংলার দুঃখ দুর্দশা, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পারিবারিক জীবনের কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। যে জীবনকাহিনী এতে তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন অনাড়ম্বর, শান্ত, তেমনি তার ভাষ্যও অনলঙ্কৃত ও জীবনানুগ — যেন সহজ জীবনের সহজতর ভাষ্য রচনা বিশেষ। গল্প ও উপন্যাসের জীবনচর্যা ও জীবন ভাবনার এই সাদৃশ্য — গ্রাম-প্রকৃতি-মানুষ, তাঁদের চলাফেরা, সংসার প্রতিপালন, সন্তান স্নেহ সবকিছুতেই যেন অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদিকটার প্রতি ল(্য করে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন পুঁইমাচা গল্পটিতে পথের পাঁচালীর বীজ আছে। অপর এক সৃষ্টিশীল লেখক-সমালোচকের বি(্বাস কোন সৃস্টির পূর্বে লেখকের মনের গভীরে প্রত্য(্ষ বা অগোচরে একটি ছক তৈরী হতে থাকে, তারই প্রতিফলন সমকালীন গল্পে-উপন্যাসে অনেক সময় প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে ওঠে। পুঁইমাচা ও পথের পাঁচালীতে এমনটি ঘটে থাকবে। পল্লীর শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবার জীবন — (্ষন্তী, সহায়হরি চাটুজ্যে ও অন্নপূর্ণা যথাস্থানে দুর্গা, হরিহর ও সর্বজয়ার পূর্বগ। দুটি রচনার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য থাকলেও উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যের কারণে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। পুঁইমাচায় পাওয়া যায় প্রকৃতির পটভূমিতে উপস্থাপিত মানুষের জীবনমৃত্যুর রহস্যঘন কতকগুলি খণ্ডচিত্র। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে যেন অনেকটা নিরাসত্(ও নির্মম।

এই গল্পটি পাঠক মনোযোগ দিয়ে পড়লে ল(্য করবেন আকস্মিক কোন ঘটনার চমকে এটি শেষ হয়নি। এটি চরিত্রপ্রধান গল্পও নয়। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটিকে লেখকের কবিপ্রাণতা ও প্রকৃতিপ্রেমের চরম উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। পৌষ-পার্বণের দিন পিঠে গড়ার শেষে জ্যোৎস্নার আলোয় উঠানের সেই জায়গায় দুই মেয়ে ও মায়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যেখানে ''লোভী মেয়েটির ..... নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে .... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'' প্রতীক হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে লেখক এখানে তাঁর প্রকৃতি দর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গল্পের প্রাণকেন্দ্রে (্ষন্তি আর তাঁর পুঁই মাচার সঙ্গে প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। এখানেই গল্পের 'স্নিগ্ধ' সৌন্দর্য। পুঁইমাচা গল্পটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে আপনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

৩৯.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বুধবার, ২৯ শে ভাদ্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) মাতুলালয় — কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারীপুর গ্রামে। মৃত্যু ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। তাঁর

বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা বনগ্রাম সংলগ্ন ব্যারাকপুর গ্রাম। মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা ও পৌরোহিত্য বৃত্তিতে সংসার প্রতিপালন করতেন। বিভূতিভূষণের শৈশব-কৈশোর অত্যন্ত দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে অতিবাহিত হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৬-তে কলকাতার রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৮-তে ডিস্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন। এম.এ ও আইন পড়বার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু সংসারের চাপে পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথম জাঙ্গীপাড়া স্কুলে, পরে হরিনাভী স্কুলে (সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা) শি(কতা করেন (১৯২০-১৯২২)। হরিনাভী ছেড়ে তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য কেশোরাম পোদ্দারের গোর(ণী সভার প্রচারকের কাজ করেন। খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহ শি(ক, খেলাৎ ঘোষের আপ্ত-সহায়ক, তাঁর এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত(হয়ে ভাগলপুর সার্কেলের কাজে চলে যান। অতঃপর তিনি খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে দীর্ঘদিন শি(কতা করলেও, জীবনের শেষ পর্বে নিজগ্রামে ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপাল নগর হাইস্কুলে শি(কতা করেন। অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় তিনি থাকতেন।

শৈশব থেকেই তিনি পল্লীপ্রকৃতির রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ ছিলেন। হরিনাভিতে থাকাকালে গল্প লেখায় প্রবল আগ্রহ জন্মে। ১৯২২-এ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘উপে(তা’ প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ভাগলপুর বাসকালে তিনি ‘পথের পাঁচালি’ উপন্যাসটি লেখেন। সেটি প্রথম বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে বের হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ (১৩৩৬) ঘটে। পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার মানুষ ও সমাজজীবন তাঁর এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তার অপর উপন্যাস আরণ্যক (১৩৪৫) ও ইছামতী (১৩৫৬) উল্লেখযোগ্য। ‘আরণ্যক’ বিহারের আরণ্যক প্রতিবেশে দরিদ্র আদিবাসী জনসমাজের সহজ সুন্দর অনাবিল জীবন প্রধান প্রতিপাদ্য। অতি পরিচিত পল্লীজীবন থেকে অনেক দূরের এই জগতটিকে তিনি শান্ত, নির্লিপ্তভাবে অন্যতম ভিন্নতর রূপকে তার এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন অলঙ্কার বর্জিত আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায়।

বাইরের পৃথিবী যখন — বিশ শতকের তৃতীয় দশকে — ভরে উঠেছে বিপ-বোত্তর রাশিয়ার প্রেরণায় বিহ্বল নূতনতর সমাজ গড়বার চেতনায়। ত(ণতর শিল্পীরা এসময় জীবনকে কখনও দেখছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে(কখনও বা ফ্রয়েডীয় যৌন-সমস্যার প্রে(তে। তাঁদের জীবন দৃষ্টিতে কখনও প্রবল প্রখর বাস্তবতা, কখনও বা আশাহত আশাবাদীর স্বপ্নভঙ্গের বেদন। এ সময়ের সাহিত্য বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন ভারসাম্য র(া করতে পারেনি। ফলে, জীবন দৃষ্টিতে সমগ্রতা ধরা পরেনি। প(ান্তরে, বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস যুগ ও সমাজ সম্পর্কে অনেকটা নির্লিপ্ত, উদাসীন, শান্ত, সহজ, কোমল ও মধুর। তাঁর গ্রাম, জনপদ, আকাশ, অরণ্য-পাহাড় স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এভাবেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ শুধু নয়, অবগাহন করে জীবন ও জগতের মহান সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন। দেশ-কালের খণ্ডিত রূপের মধ্যে — অখণ্ডজীবন সত্য খোঁজেন নি। কেননা তিনি বি(াস করতেন যা কিছু শা(েত তাকে পেতে হলে খুজতে হবে সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দ ভরা সৌম্য জীবনে। সাধারণভাবে ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’ ও ‘ইছামতী’ এই উপন্যাস চতুষ্টয়কে নির্ভর করেই তাঁর পরিচিতি ব্যাপ্ত হলেও, ছোটগল্প রচনাতেও বিভূতিভূষণের দ(তা বড় কম নয়। গ্রামের মানুষ এবং প্রকৃতি, সেখানেও তাঁর লেখার মুখ্য উপাদান। দরিদ্র গ্রামবাংলার স্বল্পবিত্ত ভদ্রগৃহস্থই তাঁর লেখার মূল কুশীলব। আর বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি — তাঁর জন্মস্থান বিশেষত, তাঁকে এমনভাবেই আবৃত্ত করে রেখেছিল যে, সামাজিক এবং পারিবারিক কাহিনী গড়ে তোলবার সময়েও তার প্রকৃতিতন্ময় ভাবটা সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকত। আর সে জন্যই কিন্তু জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যময় ভাবনাটা তাঁর গল্প-

উপন্যাসের মানুষদের সচেতন রেখেছে, কিন্তু বেদনার বা ত্রে(াধের, হাহাকার অথবা বিস্ফোরণ কোনো সময়ে ঘটেনি তাদের মধ্যে। এই বিষয়ে প্রে(তে সীমাবদ্ধভাবে হয়ত তার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কিছুটাও তুলনা করা যায়।

'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', 'বেণীগির ফুলবাড়ি', 'নবাগত', 'তালনবমী', 'উপল খণ্ড', 'বিধু মাস্টার', '(ণভঙ্গুর', 'অসাধারণ', 'মুখোশ ও মুখশ্রী', 'আচার্য কৃপালনী কলোনি', ' কুশল পাহাড়ী', 'অনুসন্ধান', 'ছায়াছবি', 'সুলোচনা', 'প্রেমের গল্প', 'অলৌকিক' এবং 'বাক্সবদল' — মোট এই কটি তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ। এছাড়া 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'বাছাই গল্প' — ইত্যাদি নামেও গল্প সংকলন আছে।

উপরোক্ত(আলোচনার নিরিখে 'পুঁইমাচা' গল্পটি পড়তে হবে।

৩৯.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন — একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন — কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটী? আঃ, (্ তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণ তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিক(ণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন — তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রী অতিরিক্ত(রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল — ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতী(ায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন — কেন .... কি আবার .... কি ....

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপে(াও শান্ত সুরে বলিলেন — দেখ, রঙ্গ কোরো না বলিছ — ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — কেন? কি গুজব?

— গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। — সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন — একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না — ও নাকি উচ্ছুগগু করা

মেয়ে —গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না — যাও ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগদী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হতির তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন — এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর! — ওঃ!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন — কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমার একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? — আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন — হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন — না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যত(ণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর তত(ণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার ল(্য করিয়া যাত্রা করিলেন — কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন — এ সব কি রে! (ে ন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে.....

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই-গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁই-পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ(ও অগোছালো — বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টো ডাগর ডাগর ও শান্ত। স(স(কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেপটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় (ে ন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল — চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম দিতে চায় না, বলে — তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দ(ণ দু'টো পয়সা বাকি আছে, আমি বললাম — দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে — আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা দিয়ে বললে, নিয়ে যা — কেমন মোটা মোটা ....

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অতযন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন — নিয়ে যা! আহা, কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে। পাকা পুঁইডাঁটা, কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত ... নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন — ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হলে না। যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ....ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে। বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? .... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন(আর একজন বেড়াচ্ছেন — কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ ..... ফেল্ বলছি ওসব ..... ফেল্।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আগলা করিয়া দিল, পুঁই শাখের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন — যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো ..... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো ....

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল। .... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন — তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে ... তুমি আবার .... বরং .....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাইল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন — না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না — মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের! একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভি(ক'রে! যা, যা .... তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয় ....

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাদের জিনিস হোক, পুঁই শাকের প(াবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না — নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল- গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় (ন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল — মা, অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের ....

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন — বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাখের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা (ন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উত্ত(পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন — কিরে (ন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? (ন্তি তৎ(ণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীমায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সং(প্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন — সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে....স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে — অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে র(। তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ-সাত পু(ষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন — তা সমাজের সে-সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের ....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন —এই শ্রাবণে তেরোয় ....

— আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলের তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো? ....সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল....পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে। জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্‌ — রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?....

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকি — শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হোক পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকারবধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল — বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন — যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি। কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল — তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল — ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সব কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন — মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল — খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও-পাড়ায় — যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতা-পাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইলে বলিলচ— খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা। — পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস ল(্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এত(ণ খুপ্ খুপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল। ... কে যেন কি খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিক(ণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা খানিক দূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, (ে ন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তী(দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন — এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এত(ণ?

(ে ন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল — এই যে যাই মা, এ(নি যাব আর আসব।

(ে ন্তির স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন — ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে — কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং ....

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন — আমি। না...আমি কখন্? .... ক(নো না, এই তো আমি...। সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না। আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখন আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ....তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বি(দ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন, কিন্তু স্ত্রী চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তি(গুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।....

আধ ঘণ্টা পরে (ে ন্তি স্নান সারিয়া, বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলু দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন — (ে ন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা.....

মায়ের ডাক শুনিয়া (ে ন্তির মুখ শুকাইয়া গেল — সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

(ে ন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে

পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল। তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন — কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এসেনছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মায়ে মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল — হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন — পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাটের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে। সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, যার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনেসে হাত? এ মেয়ে আমি কি করব মা?

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল — মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবন্ধ হইয়া ফাঁকি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্দ্ধমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন — দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল — কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। .... একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন — হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

— আচ্ছা দিচ্ছি বাবা - কই শীত, তেমন তো....

— হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে — অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?

— সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার

গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না — (েন্তির নিজস্ব ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংত্র(াত্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন —একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। (েন্তি কু(নীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে (েন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে (েন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত(করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল — মা, ঐ একটু....

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মার সামনে পাতিয়া বলিল — মা, আময় একটু ...

(েন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখি, নিয়ে আয় (েন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি। (েন্তি (িপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল — জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি (ীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

(েন্তি মুখ তুলিয়া বলিল — এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি(এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল — হ্যাঁ মা, (ীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, (ীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়েই করে, সে তো কেমন লাগে।

অন্নপূর্ণা বেগুণের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্র(েের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

(েন্তি বলিল — খেঁদীর ওই সব কথা। খেঁদীর মা তো ভারী পিঠে করে কিনা! (ীরের পূর দিয়ে ঘিরে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ....আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় (ীর দিলে ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়া ভাবে উপরোক্ত(উক্তি(শেষ করিয়া (েন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল — মা, নারকেলের কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থারা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন — ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল — মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন — ক্ষেন্তি, আর নিবি? ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তবাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল — বেশ খেতে হয়েছে মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়া নাও, ওতেই কিন্তু.....। সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তী, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন — ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ কর্ম্মে বকো, মারে, গলা দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে — এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘটনা কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাচ্ছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন — চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।.... তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল — মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও .... দু'টো মাস তো....

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন — তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক — তবে তো...

(েন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমি সুরে বলিল — না, যাবে না বৈ কি!... দেখো তো কেমন না যান্।....

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত .... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে — মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ....

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষু(সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন —ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষু(সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি (টি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন — নাঃ, সব তো আর ... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। ... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন — বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপারে কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

— একেবারে চামার.....

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ত্র(মে ত্র(মে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে.... ছোট লোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়... আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছু(ণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্প(ণ পরে বিষু(সরকার বলিলেন — তারপর?

আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে। শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে। পরে বিষু(সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন — বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেধ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গ(তে এক ঘাটে জল খেয়েছে — আজই না হয় আমি....। প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষু(সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

— তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার — বসন্ত গায়ে বে(তেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল — তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে....

— দেখতে পাওনি?

— নাঃ! এমনি চামার — গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ...যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।.... চার কি ঠিক করলে? .... পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।....

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা স(চাক্‌লি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুণ পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে — আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন' পুঁটি বলিল — আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

— ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এ(নি ধরে উঠবে....

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন — স'রে এসে বোস মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল .... খোলা আগুণে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।.....

পুঁটি বলিল — মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে ষাঁড়া ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন — একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।....

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।....

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন — দিলি?

পুঁটি বলিল — হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চালা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেক(ণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ... রাতও তখন খুব বেশি।.... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেক(ণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ত্র(মে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে ... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল — দিদি বড় ভালোবাসত.....

তিনজনেই খানিক(ণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপন-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.... সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সম ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

৩৯.৫ সারাংশ

'পুঁইমাচা' অত্যন্ত সাদামাটাভাবে লেখা একটি গল্প — যা বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী। এই কাহিনীর বিষয়বস্তু খুব ব্যাপক কিছু নয়। দরিদ্র গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারের খাদ্যলোভী এক কিশোরীর জীবনের কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি আর বিয়ের পরে তার অকাল বিয়োগের ক(ণ স্মৃতিচারণা — এই হল গল্পের বিষয়বস্তু। গরিব গৃহস্থ সহায়হরি চাটুয্যে এবং অন্নপূর্ণার তিন মেয়ের মধ্যে (ে ন্তিই বড়। সারাদিন এথা-ওথা ঘুরে বেড়ায়, খাবারদাবার কী পাওয়া যায় তারই খোঁজে। পনেরো বছর বয়স হলেও (সেকালীন বাঙালি গ্রাম্য সমাজের প্রথাকে বজায় না রেখে) এখনও তার বিয়ে হয়নি। সম্বন্ধ হয়ে, আশীর্বাদ হবার পর একটা বিয়ে ভেঙে গেছে পাত্রের চরিত্রদোষের খবর আসায়। এ নিয়ে গাঁয়ে ঘোঁট পাকায় কর্মহীন, ছিদ্রান্বেষী মাতব্বরেরা। পিতা এবং কন্যা এতে নির্বিকার থাকলেও মায়ের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

গল্পের শু(হয়েছে, সহায়হরি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গাছকাটা-খেজুর রস সংগ্রহের জন্য উৎসাহ সহকারে যাবার উদ্যোগ করার জন্য স্ত্রীর কাছে ভর্ৎসিত হবার পটভূমিকায়। ঠিক সেই সময়েই (ে ন্তির আবির্ভাব আরেক প্রতিবেশী বাগানের জঞ্জাল হিসেবে ফেলে দেওয়া একরাশ পাকা পুঁইডাটা এবং ধার করে চেয়ে আনা একমুঠো কুচো চিংড়ি নিয়ে, সঙ্গে ছোট চোনা পুঁটি। ত্রু(দ্ধা মায়ের তিরস্কারে দুই কন্যা খিড়কির পুকুরের ধারে পুঁইডাটার বোঝা ফেলে দিয়ে এলে, সমস্যাটা তখনকার মতো মিটল।

অন্নপূর্ণা মেয়েকে যতই তিরস্কার ক(ন, হাজার হোক মাতৃহৃদয় — দুপুরবেলায় সবার অগোচরে 'পাঁদাড়ে-ফেলা' ঐ পুঁইশাকেরই খানিকটা আবার উদ্ধার করে এনে, রান্না করে যথা সময়ে স্বামী-কন্যার পাতে সেই চচ্চড়ি পরিবেশন করলে (ে ন্তির মুখে হাসি ফুটে ওঠে।... এইভাবেই দুঃখের ভাত সুখ করে খেয়ে দিন কাটে চাটুয্যে পরিবারের। কখনো বাবাতে-মেয়েতে লুকিয়ে অন্যের পোড়ো বাগানের জংলা জমির তলা থেকে বিশসেরী মেটে আলু তুলে এনে অন্নপূর্ণার কাছে ভর্ৎসিত হয়। কখনো বা, পৌষ-পার্বনের দিনে, দুঃখের সংসারে হাসি ফোটে পিঠে, পাটিসাপ্টা তৈরি হলে। এরই মধ্যে ভাঙা পাঁচিলের ধারে ফেলে দেওয়া সেই পুঁইশাকের ডাঁটা থেকে একটি শীর্ণ পুঁইচারা জন্মালে তিন মেয়ের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

পরের বৈশাখে (ে ন্তির পাত্র জোটে। তার বর বছর চল্লিশ বয়সের দোজবরে হলেও পাত্র হিসেবে পাঁচজনের বিচারে ভাল বলেই গণ্য হয়, ''ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি'' করেছে সে। কিন্তু বরপণের আড়াইশো টাকা বকেয়া পড়ে থাকায় (ে ন্তির সমাদর মেলেনি (েশুরবাড়িতে, বাপের বাড়িতেও তার আসা হয়নি আর। সহায়হরি মেয়েকে দেখতে গিয়ে কুটুমবাড়িতে অসম্মানিতও হন তাঁর দারিদ্র্যের কারণে।

বছরখানেকের মধ্যেই বসন্তরোগে (ে ন্তির জীবনাবসান ঘটল। নির্মম (েশুরকুলের লোকেরা তার দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়িতে রোগাত্র(ান্ত অসহায় মেয়েটাকে ফেলে রেখে যায়, সহায়হরিকে কোনও খবর-টবর না দিয়েই। গায়ের সোনা গয়নাগুলোও খুলে রেখে দেয় (ে ন্তির (েশুরবাড়ির লোকজন।

আবার ঘুরে আসে পৌষপার্বণের তিথি। বড় মেয়ের বিয়োগব্যথা বুকে জমিয়ে রেখেই অন্নপূর্ণা এবারও পিঠে গড়তে বসেন দুই মেয়েকে নিয়ে। তিনজনেরই মন হু-হু করে (ে ন্তির কথা ভেবে। তারপর উঠোনের এক কোণে নজর গিয়ে পড়ে, যেখানে (ে ন্তির হাতে পোঁতা সেই পুঁইচারাটি এতদিনে মাচা জুড়ে বেড়ে উঠেছে... ''বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশিরে'' পরিপুষ্ট হয়ে, মাচা থেকে ঝুলে পড়ে কচি সবুজ পুঁই ডগাগুলি দুলছে, ''সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' হয়ে। সেটি শুধু (ে ন্তির স্মৃতির সংকেতবাহী নয়, যেন তারই প্রতিরূপা হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।

৩৯.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

'পুঁইমাচা' গল্পের ((ন্তির মধ্যে অনেক সমালোচকই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দুর্গার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। এখালে বলা ভাল যে, 'পথের পাঁচালী' প্রথমে যখন লেখা হয়, তখন দুর্গার চরিত্র সেখানে ছিল না। আকস্মিকভাবে দুর্গার মতন একটি কিশোরী মেয়েকে প্রত্য(করে, বিভূতিভূষণ তাকেই দুর্গার প্রত্নপ্রতিমা (বা আর্কিটাইপ(কোনও সৃস্টির প্রথম কাঠামো) হিসেবে গ্রহণ করে চরিত্রটিকে গড়ে তোলেন। ঠিক একই রকমের অভাবী গৃহস্থ পরিবারের ছন্নছাড়া, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ধরনের মেয়ে, খাদ্যে আসক্তি(অপরিমিত(স্বভাবটি নম্র(মায়ের স্নেহ, শাসনকে মান্য করে এবং অল্প বয়সেই জীবনাবসান ঘটে ((ন্তি এবং দুর্গা উভয়েরই। প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে দুর্গার মতোই ((ন্তিও ওতঃপ্রোতভাবেই যেন জড়িয়ে থাকে। ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পুঁইমাচা' প্রকাশিত হয়(এর কিছু দিন আগে থেকে 'পথের পাঁচালী' লেখা শু(করেন বিভূতিভূষণ। পরবর্তী সময়ে দুর্গর চরিত্রটি 'পথের পাঁচালী'তে সন্নিবিষ্ট করার আগে, 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে তার একটা পূর্ব-প্রতিভাস ((ন্তির চরিত্রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না।

গ্রামের মানুষ এবং তাঁদের নিত্যদিনের শোক সুখ, অভাব-আনন্দ, হীনতা - মহত্ত্ব — বিভূতিভূষণের লেখার এই হল অন্যতম প্রধান উপজীব্য। 'পুঁইমাচা'-ও এই সীমানারই অন্তর্বর্তী। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় — নৈকট্যও তাঁর উপন্যাস এবং গল্পের আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণ। 'পুঁইমাচা'-য় সেটিও প্রত্য(করা যায়। কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পের একটা অনন্যতা রয়েছে — যা ঐ প্রকৃতি তন্ময়তার মধ্যেও ভিন্নতর এক মাত্রাবিন্যাস করেছে। গল্পের শেষে যে বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ঐ পুঁইমাচাটির — সেটি এখানে স্মরণযোগ্য ঃ ''সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'' এরই পাশাপাশি গ্রাম্য সমাজের ছবিটাও নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে 'পুঁইমাচা' গল্পে। ((ন্তির বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যাবার পরিপ্রে(িতে স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রী 'গাঁওবুড়ো'-দের নির্খুতভাবেই তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ। অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্নতা, অশি(া এবং কূপমণ্ডুকতা — এই তিনে মিলে প্রায় 'ত্র্যহস্পর্শ' যোগ ঘটেছে সেখানে। ((ন্তির বিয়ের আশীর্বাদ হবার পরেও পাত্রের দুশ্চরিত্রতার খবর পেয়ে সহায়হরি যে, আর এগোলেন না ঐ সম্বন্ধের সূত্রে — এতে কিন্তু আবার তার ব্যক্তি(ত্বেরও একটা হদিশ মেলে, মূল্যবোধেরও। এর ফলে গ্রাম্য মোড়লদের বৈঠকে তাঁকে তিরস্কৃতও হতে হয়, যদিও তার পিছনে ছিল কালীময় মজুমদার প্রমুখের ব্যক্তি(গত কিছু স্বার্থহানি হবার কারণজাত আক্রো(শই (ঐ লম্পট পাত্রটির বাবার কাছে তিনি ঋণ করে রেখেছিলেন, ((ন্তির সঙ্গে সে-হেন অপাত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তিনি কিছুটা সুবিধে পেতেই সচেষ্ট ছিলেন, এই আর কি!) আবার এই গ্রাম্য সমাজেই দীনদরিদ্র গয়া বুড়ির মতো নারীকেও দেখা যায়, যিনি কোনও দিন দাম শোধ হবে না জেনেও ছেলেমানুষ ((ন্তিকে এক মুঠো কুচো চিংড়ি দেন তার তরিবৎ করে পুঁইশাক খাওয়ার সাধ মেটাতে। পাড়াপড়শির মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব বিবাদ যাইই থাক — একজনের সুখে-দুঃখে আরেকজন পাশে এসে দাঁড়ায়ও সর্বদা। এই সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ এমনভাবে তার চিত্রায়ণ করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু এই গল্পেই নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মেই।

প্রধান চরিত্র তিনটির মধ্যে সহায়হরি এবং অন্নাপূর্ণার মানসিক প্রবণতার কিছুটা পরিচয় উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া গেছে। সহায়হরি দরিদ্র, কিন্তু আত্মসম্মানহীন নন। লুকিয়ে পরের বাগান থেকে মেটে আলু চুরি করতে কিংবা স্বচ্ছল প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে খেজুর রস চেয়ে আনতে যেমন তিনি কুণ্ঠাহীন, ঠিক তেমনই আবার পিতৃস্নেহে এবং চরিত্রগত মূল্যবোধের জন্য তিনি শ্রদ্ধার্হ। ে(ন্তির প্রথম সম্বন্ধটি ভেঙে দেবার ে(ত্রে তাঁর এই দুটি প্রবণতাই একত্রে মিলে গিয়ে ঐ সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে(মতা জুগিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গত তিরস্কারের সামনে আমতা-আমতা করলেও, সমাজপতিদের রত্ত(চ(কে উপে(া করার মতো মনোবল তাঁর ছিল। আবার দারিদ্র্যের কারণে মেয়ের (শুরবাড়িতে অপমানিত হলেও কোনও প্রতিবাদের ভাষা তাঁর মুখে জোগায় না। জামাইবাড়ির লোকেদের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতায় আদরিণী কন্যার মৃত্যু ঘটলে তিনি মর্মান্তিক বেদনা পান ঠিকই, কিন্তু তার অল্পদিন পরেই আবার বন্ধুর সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার তোড়জোড়ও করতে দেখা যায় সহায়হরিকে। আসলে এই মানুষটি নানা ধরনের বৈপরীত্যের সমাহারে তৈরি। তাই এঁকে পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই করা যায় না। আবার পার্(চরিত্র হিসেবে গণ্য করে উপে(া করাও তাঁকে অসম্ভব। নীতিবোধ কখনো দুর্বল(কখনো প্রবল(কোনো সময়ে ব্যত্তি(ত্বহীনতায় গ্রস্ত, কখনো বা ব্যত্তি(ত্বে উজ্জ্বলপ্রভ(কখনো দুঃখে-আনন্দে সচকিত — কখনো নিরাসত্ত(, নির্বেদনে স্বস্থ। ফলত, এইসব বহুমাত্রিক বৈপরীত্য তাঁর চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

অন্নপূর্ণা চরিত্রটি প(ান্তরে একমাত্রিক। শুধু ে(ন্তিই দুর্গার পূর্বপ্রতিমা (বা, আর্কিটাইপ) নয়, অন্নপূর্ণাকেও সর্বজয়ার প্রতিকল্প বলে স্বচ্ছন্দেই মনে করা যায়। দরিদ্রের সংসারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে পাঁচটি প্রাণীর উদরান্নের জোগাড় করা যে কী দুঃসাধ্য দায়িত্ব তা হয়ত তিনিই জানেন। দারিদ্র্যের কারণে সঞ্জাত স্বামী-কন্যার ঐ খাদ্যলোলুপ স্বভাবের প্রতি তিনি বিরত্ত(। অথচ মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক অনুভবও তাঁর চরিত্রের মধ্যে সুনিবিড়। পরের বাগানের 'ফেলে দেওয়া জঞ্জাল' কুড়িয়ে আনার জন্য কিংবা মেটে আলু চুরি করার জন্য তিনি যেমন ত্রু(দ্ধ হন, তেমনই আবার রাগ করে ফেলে দেওয়া পুঁই ডাঁটারই চচ্চড়ি রেঁধে লোভাতুর কন্যার পাতে তুলে দিয়ে তিনি তৃপ্তি পান। মেয়ের স্বভাবের মধ্যে ঐ খাদ্যলোলুপতাটুকু ছাড়া আর কোনো বিচ্যুতিই যে নেই, তা আর তাঁর চেয়ে বেশি কে বোঝে ''ে(ন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথাটি কখনো কেউ শোনেনি''। ঠিক এই কারণেই শঙ্কিতব(তিনি মেয়ে (শুরঘর করতে পাঠাবার সময়ে ভেবেছেন ''ে(ন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?''

পরের বছরের পৌষ-পার্বনের দিনে সন্ধ্যার পরে ছোট দুই কন্যাকে নিয়ে পিঠে গড়তে বসে তাই তাঁর চিন্তার মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে মৃতা জ্যেষ্ঠা দুহিতার বেদনাময় স্মৃতি। তার নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটির মাচাভরা বিস্তৃতি দেখে যেন সেই তৃণগুল্মের সতেজ, সবুজ ভাবটুকুর মধ্যেই প্রয়াতা কন্যার কৈশোর-লাবণ্যকে অনুভব করেন অন্নপূর্ণা। সেই খাদ্যলোলুপ, শান্ত স্বভাবের, ভী(, অগোছালো কন্যাটির বিয়োগের পরেও যেন তিনি তাকে, তার স্মৃতিমেদুর অল(্য অস্তিত্বকে খুঁজে পান সেখানে। বাস্তবে-কল্পনায় এভাবে মেশামিশি হবে তাঁর স্নেহক(ণ মাতৃহৃদয় উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

ে(ন্তির চরিত্রটি অবশ্যই অভিনব নয়। বারংবার দুর্গার কথা তার প্রসঙ্গে মনে পড়বেই। তার খাদ্যলোভ স্বভাবগত ঠিকই, কিন্তু মূল উৎসটা দারিদ্র্যই। ঠিক একই কথা 'পথের পাঁচালী'-র মধ্যে অনেকবারই বলেছেন বিভূতিভূষণ — এখানেও সেটি নানান্ ব্যঞ্জনায় তিনি ব্যত্ত(করেছেন। তাই ে(ন্তির এই দোষটি তাকে সামান্য মেটে আলুর মতো তুচ্ছ বস্তু চুরি করতেও প্ররোচনা দিয়েছে। (অবশ্য সেই অপকর্মে সে ছিল তার বাবার

সহকারিনী মাত্র!) ৎ(স্তির শান্ত, অগোছালো, লাজুক এবং ভী(স্বভাবটির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার ট্র্যাজেডির রন্ধপথ। বরপণ ইত্যাদি সব সামাজিক অনাচার, অপহ(ব সেই ট্র্যাজেডির উৎস হলেও, নিজের স্নিগ্ধ স্বভাবটির জন্যই সে প্রতিবাদ করতে শেখেনি এবং (শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, অবিচারের শিকার হয়েছে তার ফলে। খাদ্যলোলুপতা ৎ(স্তির জীবনের একমাত্র ক্রুটি, কিন্তু সেটাও বিভূতিভূষণের লেখার গুণে (মার যোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলে, সরল এবং শান্ত এই গ্রাম্য কিশোরীটিও বস্তুতপ(রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের নি(পমার মতোই পণপ্রথার শিকার হয়ে উঠেছে।

'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য সেভাবে কিছু অবশ্য নেই। দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও পারিবারিক অবিচার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পের উল্লেখযোগ্যতা অন্যত্র। প্রকৃতি ও মানুষে নিবিড় একটি সম্পর্ক বিভূতিভূষণের লেখায় বহু-বহুবারই দেখতে পেয়েছি আমরা। কিন্তু কাহিনীর পরিণামে সতেজ, লাবণ্যময় পুঁই মাচাটির বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে কিশোরী ৎ(স্তির স্মৃতিময় রূপটি মিশে একাকার হয়ে গিয়ে যে বিচিত্র রসানুভূতির সঞ্জনন ঘটেছে, তা কিন্তু বাস্তবিকই তুলনাবিরল। এই অন্যস্বতন্ত্র অনুভবের কারণেই এই গল্প এত সাধারণভাবে শু(এবং বিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও, পরিণামে এমন শিল্পঋদ্ধি অর্জন করেছে। 'পুঁইমাচা' নামটির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যও সেখানেই নিহিত।

৩৯.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) 'পুঁইমাচা' গল্পটি নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বি(-ষণ করে দেখান।

২) ৎ(স্তি এবং অন্নপূর্ণা, যথাত্র(মে দুর্গা এবং সর্বজয়ার পূর্বপ্রতিমা কি-না আলোচনা ক(ন।

৩) ''মানুষ এবং প্রকৃতি বিভূতিভূষণের লেখায় খুব ঘনিষ্ঠ এক তন্ময়-সম্পর্কে নিবিড় হয়ে থাকে(কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।'' — এই মন্তব্যের যাথার্থ্য আলোচনা ক(ন।

৪) বাংলার পল্লীসমাজের কুচত্র(ী পটভূমি একদিকে, অন্যদিকে সহজ সরল প্রতিবেশী বৎসল প্রে(ত — এ-দুটিই এ-গল্পে কেমন করে সহাবস্থান করেছে আলোচনা ক(ন।

৫) ''ৎ(স্তি এবং অন্নপূর্ণা বিভূতিভূষণের লেখায় টাইপ-চরিত্র হলেও, সহায়হরি কিন্তু তা নন।'' — একথা কতদূর মান্য আলোচনা ক(ন।

৬) এই কাহিনী ট্র্যাজেডি হলেও — এর মধ্যে একটি সমাহিতভাব অনুভূত হয় কী ভাবে, আলোচনা ক(ন।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ৎ(স্তির প্রথমবারে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল কী কারণে?

২) ফেলে দেবার পরেও অন্নপূর্ণা পুঁইডাটা তুলে এনে চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন কেন?

৩) মেটে আলু তুলে আনা নিয়ে সহায়হরি এবং অন্নপূর্ণার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল?

৪) পৌষ-সংত্র(ান্তির সন্ধ্যায় চাটুয্যেবাড়িতে পাটিসাপটা তৈরি করা নিয়ে যে কথাবার্তা হয়, তার তাৎপর্য কী?

৫) অন্নপূর্ণ কেন চিন্তিত হয়েছিলেন (েন্তির (শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে?

৬) পুঁইমাচাটি অন্নপূর্ণা এবং তাঁর ছোট দুই মেয়ের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল?

☐ সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ☐

১) সহায়হরি কার কাছে থেকে রস আনতে যেতে চাইছিলেন?

২) (েন্তিকে পুঁই ডাঁটা কে দিয়েছিলেন?

৩) চিংড়ি মাছ (েন্তি কার কাছ থেকে পেয়েছিল?

৪) কার ‘‘বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়’’?

৫) কোন্ গাঁয়ের কার ছেলের সঙ্গে (েন্তির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েও ভেঙে গিয়েছিল?

৬) মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকীর নাম কী?

৭) মেটে আলু কোথায় পোঁতা ছিল?

৮) চৌকিদারের নাম কী?

৯) (েন্তির জামা কত টাকায় কেনা হয়েছিল?

১০) (েন্তির বর কিসের ব্যবসা করতেন?

১১) সহায়হরি ‘‘বিখ্যাত’ পূর্বপু(ষের নাম কী?

১২) (েন্তির বরপণ কত বাকি ছিল?

১৩) সহায়হরি কার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছিলেন?

১৪) (েন্তির মৃত্যু কোথায় হয়েছিল?

১৫) ‘ষাঁড়া ষষ্ঠী’ কোথায় অধিষ্ঠান করেন?

১৬) পুঁটি ও রাধী কোথায় পিঠে ছুঁড়ে দিয়েছিল?

১৭) ষাঁড়া ষষ্ঠীর উদ্দেশে পিঠে ফেলার সময় কে পালিয়ে গিয়েছিল?

১৮) পৌসপার্বণের রাত্রে কোন্ পাখি ডাকছিল?

৩৯.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ অনুসরণে উত্তর ক(ন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদির (৬৩.৬) প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর ক(ন।

৩) প্রস্তাবনা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশ বার বার পড়ে উত্তর তৈরী ক(ন।

৪) গল্পটি ভাল করে পড়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বি(-ষণের সাহায্যে উত্তর দিন।

৫) ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও ভাব-রস বি(-ষণ করে আলোচ্য গল্পের রসপরিণতি প্রাসঙ্গিক আলোচনা অবলম্বনে বুঝিয়ে দিয়ে উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) (ে ন্তির বিয়ের প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল, শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সঙ্গে। (ে ন্তির বাবা টের পান পাত্রটি স্বগ্রামে কি একটা করবার ফলে জনৈক কুম্ভকার বধুর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহারে শয্যাগত ছিল। এরকর পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না বলে সহায়হরি সম্বন্ধ ভেঙে দেন।

২) (ে ন্তির আনা পুঁই-ডাটা ফেলে দেবার পর অন্নপূর্ণার রাঁধতে রাঁধতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এও মনে পড়ে যে অরন্ধনের পূর্বদিন পুঁইশাক রান্নার সময় (ে ন্তি আবদার করে বলেছিল। ''মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের।'' তিনি নিজেই স্নেহের টানে উঠান ও খিড়কী থেকে ডাঁটা কুড়িয়ে এনে কুঁচো চিংড়ি দিয়ে চুপি চুপি তরকারী রেঁধেছিলেন।

৩) সহায়হরি পনেরো-ষোল সের ভারী মেটে আলু ঘাড়ে করে নিয়ে এসে, স্ত্রীকে দেখে কৈফিয়ত হিসেবে বলে, ময়শা চৌকিদার তাঁকে দিয়েছে। অন্নপূর্ণা বরোজপোতার বন থেকে চুরি করে আনার অভিযোগ করেন। সহায়হরি অস্বীকার করতে সচেষ্ট দেখে, তিনি অনুযোগ করে বলেন যে তার ইহকাল-পরকাল তো গেছেই, চুরি-ডাকাতি করতে ইচ্ছে হয় ক(ন। কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে নেওয়া কেন।

৪) পৌষ-সংক্র(ান্তির দিন পাটি-সাপটা তৈরী করার যে বর্ণনা আছে, তার বর্ণনা সং(প্ত আকারে বর্ণনা ক(ন।

৫) (ে ন্তির (শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাবার সময় তার বুক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে (ে ন্তিকে কি অপরে ঠিকমত বুঝবে।

৬) পৌষ সংক্র(ান্তির জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে অন্নপূর্ণা ও তাঁর দুই মেয়ের যখন পিঠে গড়া প্রায় শেষ -দুই বোনের খাওয়ার জন্য যখন কলার পাতা ছিড়ছে। পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে — ''দিদি বড় ভাল বাসত।'' এরপর তিনজনই কেমন যেন আচ্চৰন হয়ে পড়ে। লোভী মেয়েটির স্মৃতি তাদের আচ্ছন্ন করে নজর পড়ে (ে ন্তির হাতে সাধের পুঁই গাছটি — মাচাটি জুড়ে রয়েছে গাছটি — সে যেন পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়িয়ে রয়েছে। সে বেড়ে উঠেছে — বর্ষার জল আর কার্তিক মাসের শিশিরে। তার কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে ধরেনি। মাচার বাইরে দুলছে, সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

প্রদত্ত প্র(েগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পরে একটি বাক্য উত্তর ক(ন।

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্য — *শ্রেষ্ঠ গল্প*

২) ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — *বিভূতিভূষণ ঃ মন ও শিল্প*

৩) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৪) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার*

৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *বাংলা গল্প বিচিত্রা*

৬) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*

একক ৪০ ❑ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারিণী মাঝি

গঠন

৪০.১ উদ্দেশ্য

৪০.২ প্রস্তাবনা

৪০.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৪০.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

৪০.৫ সারাংশ

৪০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৪০.৭ অনুশীলনী

৪০.৮ উত্তরমালা

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.১ উদ্দেশ্য

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন কথা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি(ত্ব। তিনি গল্প ও উপনযাস দুটি ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'কল্লোল' পত্রিকায় ছোট গল্প লিখেই তাঁর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শু(। কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা উপন্যাসে গ্রাম বাংলাকে নিয়ে রচিত এপিকধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তথাপি রাঢ়ের গ্রামীণ প্রতিবেশে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলি শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি(রূপে গণ্য।

'তারিণী মাঝি' এমনই একটি গল্প। প্রসঙ্গে ও প্রকরণে তারাশংকরের এই গল্পটিকে অনেকটা আদিম মহাকাব্যধর্মী বলা যায়। এখানে তারিণী চরিত্রে যে আদিম জৈব-প্রবৃত্তির (elemental passion) পরিচয় পাওয়া যায়, তা মানুষের মৌলিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সহজাত উপাদান। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি(নেই। অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামের মত একে এড়িয়ে যাবার শক্তি(ও নেই। প্রেম আর আত্মর(ার দ্বন্দ্বে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি প্রেমনির্ভরতাকেও পরাভূত করে। এ গলেপর এটিই ট্রাজেডি।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন —

১) 'তারিণী মাজি' চরিত্র প্রধান গল্প।

২) গল্পটি বীরভূমের ময়ূরা(ী নদী তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত।

৩) ময়ুরা(ী নদী এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র তারিণী মাঝি ও তার স্ত্রী সুখীর সঙ্গে সমান গু(ব পেয়েছে। ময়ূরা(ীর জীবন্ত, দুর্দান্ত স্বভাবের বর্ণনা তাকে এখানে অনেকটা সজীব ও স্বতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪) এই গল্পে দেখান হয়েছে প্রেম ও প্রাণশক্তি(র মূলগত ভেদ আছে।

৫) গল্পটির আপনি ল(্য করবেন মানুষের প্রেম ও প্রাণশক্তি(র দ্বন্দ্বে, প্রাণের দাবীই প্রধান। মানুষের আদিম অসংস্কৃত জৈব প্রবৃত্তিই একান্তভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই বাঁচার তাগিদে অপরকে পাশবিকভাবে হত্যা করলেও সে পরাঙ্মুখ হয় না।

৬) গল্পটিতে আপনি বীরভূমের ময়ূরা(ী নদী-তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের বিশেষ ভাষা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাবেন। লেখকের ভাষা গঠনে অসামান্য দ(তার পরিচয় পাওয়া যায়, গল্পের ভাষার নিরাসক্ত(, নির্মম ও অমোঘ রূপের মধ্যে। ভাষা একান্তভাবেই চরিত্রানুসারী।

৪০.২ প্রস্তাবনা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'তারিণী মাঝি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প — প্রকাশ ১৩৩৫-এর পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার'-এ। রচনাটি তারাশংকরের জীবন ভাবনা ও শিল্প কর্মের উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি বস্তুতঃ জীবনের স্বভাবধর্মকে বুঝতে গিয়ে অধিকাংশ (ে ত্রে রাঢ়ের পরিচিত প্রতিবেশে লালিত নির(র, অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনা ভরপুর মানব মানবীকে আশ্রয় করেছেন। তাই তাঁর কাহিনীবৃত্ত নিটোল, বাহুল্য বর্জিত, পরিমিত ও সংযত(চরিত্রগুলি রাঢ়ের শুষ্ক রাঙামাটির মত অনেক সময় আদি অসংস্কৃত, জৈবপ্রকৃতির অনুসারী —ভালমন্দের বিচার রহিত। গল্পকার তারাশংকরের এটি নিজস্ব (ে ত্র। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে অভিনব ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উপরোক্ত(প্রে(িতে জৈবিক তাড়না ও মানবিক বোধ এই দুয়ের দ্বন্দ্বে যে বিশাল জল সমাজকে তারাশংকর প্রত্য(করেছিলেন — তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি 'তারিণী মাঝি'।

গল্পটি পাঠ করার পর প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে আপনি গল্পের প্রকৃত মর্মবস্তু যথাযথ অনুধাবন করতে পারবেন।

৪০.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৭.১৮৯৮ — ১৪.৯.১৯৭১) জন্মেছিলেন বীরভূমের লাভপুরে গ্রামের একটি মধ্যবর্গীয় ভূস্বামী পরিবারে। তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলে (য়িষু(জমিদার, আয় ছিল সামান্যই। তিনি ছিলেন এই শ্রেণীর এক অন্তিম প্রতিনিধি।

গ্রামীণ পরিবেশে তারাশংকর তাঁর শৈশব-কৈশোরের পাঠ সাঙ্গ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেওয়ায় ১৯২১-এর তিনি অন্তরীণ হন। াবার ১৯৩০-এ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ায় কারা(দ্ধ হন। জেল থেকে বেরিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে কিছুদিন কয়লার ব্যবসা, পরে কানপুরে চাকরী নিয়ে যান। এ সব কাজে মন বসেনি। পরিশেষে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত নেন। আমৃত্যু সাহিত্যই ছিল তাঁর অবলম্বন। দ(িণ পূর্ব বীরভূমের আঞ্চলিক প্রতিবেশের প্রত্য(অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা জীবন ছিল তাঁর সিদ্ধকাম সৃষ্টির প্রেরণা। তাই গ্রাম বাংলার বিশেষত রাঢ়ভূমির মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁর লেখায় ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করে রেখেছে। সমাজ

ও পরিবার —এই দুটি প্রে(তেই তাঁর কাহিনীগুচ্ছের উপকরণ(কিন্তু মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় আলোছায়াময় অসংখ্য স্তরকেও তিনি অন্বেষণ করে কাহিনীর ভাবরূপকে গড়ে তুলেছেন। নিজের সক্রি(য়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন বলেও সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি পৌঁছনোর সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার — দুই পরিচয়েই তিনি প্রথিতযশা। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কবি', 'অভিযান', 'রাইকমল', 'রাধা', 'বিচারক', 'অরণ্যবহ্নি(' —ইত্যাদির। আর তাঁর ছোটগল্পের মোট সংখ্যা ১৯০টি। এগুলির মধ্যে সুপরিচিত ও বহু-আলোচিত অনেক কটিই(যেমন ঃ 'রসকলি', 'মালা-চন্দন', 'জলসাঘর', 'বন্দিনী কমলা', 'রায়বাড়ি', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'না', 'জটায়ু', 'কালাপাহাড়', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার',—ইত্যাদি। মোট ৩৫টি গ্রন্থে এগুলি বিধৃত আছে। 'রসকলি', 'জলসাঘর', 'শিলাসন', 'পৌষলক্ষ্মী', 'হারানো সুর', 'দীপার প্রেম' ইত্যাদি এদের মধ্যে উল্লেখ্য।

তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এক-অর্থে চলমান ইতিহাসের ছবি যেমন বিম্বিত হয়েছে, তেমনই আবার মানুষের মনের বহুবিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণও তার মধ্যে রূপান্বিত হয়েছে। ফলত, জীবনের প্রে(াপট এবং অন্তর্লোক— দুইই তাঁর লেখার মধ্যে বিপুল প্রতীতি নিয়ে উপস্থিত আছে। এই বিশাল ব্যপ্তির জন্যই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অত্যন্ত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে।

তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিও দেওয়া হয়। তিনি বিধানসভার সদস্য, লোকসভার মনোনীত সদস্যও ছিলেন।

৪০.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামে।

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী উপলে(ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ময়ূরা(ীর গণুটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিল। পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়।

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাক(ণরা, আর লয়। গঙ্গাচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি নোক বাবা, এই ছেলেটি। ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।

সাবি ওরফে সাবিত্রী ত(ণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি ত(ণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, তোরা যা, আসছে খেপে আমরা সব একসঙ্গে যাব।

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই খেপেই চাপ। তোমরা সব একসঙ্গে চাপলে ডোঙা ডুববেই। মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়িদের খেপেই ডুববে মাঝি। কেউ দশ বার, কেউ বিশ বার গঙ্গাচান করেছে ওরা। আমাদের সবে এই একবার।

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো কেউ, দেখ, এখনও দেখ। — বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িল। লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব — হরিবোল। যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল — হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরা(ী নিম্নস্বরে ক্রু(র হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্ত(ভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে — এঁটে ধর্ দাঁড়, হ্যাঁ — সেঙাত, আমার ভাত খায় না গো! টান দেখছিস্ না?

সত্য কথা, ময়ূরা(ীর এই খরস্রোতই বিশেষত্ব। বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরা(ী ম(ভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রা(সীর মত ভয়ঙ্কারী। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর (েত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া-মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে সচরাচর হয় না। বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিল।

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। একজন পু(ষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিল।

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও না। তুমিই উড়ে যাবা।

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া দিল। সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল — আর্ত কলরব।

ডোঙার যাত্রী সব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুঁশ করে! তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়ি মা, কাঁপছ কেনে, ধর ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধর। ভয় কি? এই দেখ আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছি।

নদীও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তারিণী বলিল, কেলে!

কী?

নদীব(ের উপর তী(্ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর্ দেখি।

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িল। তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই — দেখ — হুই — হুই ডুবিল। বলিতে বলিতে সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপর কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা।

কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, এই বুড়িয়া পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি।

পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূর গিয়া ভাসিয়া

উঠিতেছিল। তাহাকে ল(্য করিয়াই তারিণী (িপ্রগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। সে চলার মধেয যেন কত স্বচ্ছন্দ গতি। বস্তুটার নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও ডুবিল। দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হাতে তাহার ঘন কালো রঙের কি রহিয়াছে। তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

দুই তীরের জনতা, আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে ল(্য করিতেছিল। এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল।

অন্য তীরের জনতা চীৎকার করিয়া প্র(করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছিল।

তারিণীর ভাগ্য ভাল। জলমগ্ন ব্যক্তি(টি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু(ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনারতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা ল(্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি খানিকটা জল খাইয়াছিল কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয় — অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতান্ত কচি মেয়ে — তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়(দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে — কানে মাকড়ি, নাকে টানাদেওয়া নথ, হাতে (লি(গলায় হার। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। অল্প(ণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও (শুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, 'পেনাম ঘোষমশাই।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী কহিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও দম লাও। সেই যে বলে — লাজে মা কুঁকড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

ঘোষমহাশয় বলিলেন, কী চাই তো তারিণী, বল?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কী তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম — আট আনা।

জনতার মধ্য হইতে সেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, অ মরণ আমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপু।

তারিণী যেন এত(ণ খেয়াল হইল, সে হেঁটমাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ-মশাই।

জনতার মধ্যে হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্তে জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

বধূটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল — রাঙা করতলের উপরে সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকঝক করিতেছে।

ঘোষমহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে পাঁচ টাকা।

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিল, আজ্ঞে হুজুর চাদরের বদলে যদি শাড়ি —

হাসিয়া ঘোষমহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।

তারিণী বলিল, নেহাত কালো কুচ্ছিত মা।

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেচিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা — শুধুই — অ্যা —অ্যাই — একটো —

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁ।

তারিণী বলিল, জলাম্পয় — সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান স — ব সমান।

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। বাড়ির দরজায় একটা আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী — তারিণীর স্ত্রী।

তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো — তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতে আমদানি —

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরাতে হবে। লত কই — কই কোথা গেল শালার লত?

সুখী বলিল, কোন্ দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তু।

তারিণী ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেনে, কি করলাম আমি।

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি —

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল তু বল্ বলে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার — অ্যাই।

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল।

তারিণী ডাকিল, সুখী, অ্যাই সুখী, অ্যাই!

সুখী কোন উত্তর দিল না। তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল। পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল, চল, এখুনি তোকে যেতে হবে।

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়।

তারিণী বলিল, আলবত যেতে হবে। হাজার বার — তিনশো বার।

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড় — যাব, চল। তারিনী খুশি হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিল। সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিতেছিল, চল্ তোকে পিঠে নিয়ে ঝাপ দোব গনুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে।

সুখী বলিল, তাই যাব, ভাত খেয়ে লাও দেকিন।

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত খাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিল।

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তুলি নাই সেবার এক জোড়া গো(? পনের টাকা — পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে নিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কী করে হল? বল্ কে— তোর কোন্ নানা দিলে?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার প(ভাল। তারিণী বলিল, শালা মদনা — লিলি ঠকিয়ে — লে। সুখীর শাঁখাবাঁধা তো হয়েছে, ব্যস্ আমাকে দিস আর না দিস! পড়ে শালা একদিন ময়ূরা(ীর বাণে — শালাকে গোটা কতক চোবল দিয়ে তবে তুলি।

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকা।

সুখী প্র(করিল, আর দু টাকা কই?

তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে— যা লিয়ে যা।

সুখী এ কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভাস নয়। তারিণী আবার বকিতে শু(করিল, সেবার সেই তোর যখন অসুখ হল, ডাক পার হয় না, পুলিস সাহেব ঘাটে বসে ভাপাইছে হুঁ হুঁ বাবা — সেই বকশিশে তোর কানের ফুল। যা তু যা, এখুনি ডাক্ লদীর পার থেকে, এই, উঠে আয় হারামজাদা লদী। উঠে আসবে, যা যা।

সুখী বলিল, দাঁড়াও আয়নাটা লিয়ে আসি, লতটা পরি(তারিণী খুশি হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখি।

সুখীর মুখে পুলকের আবেগ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

তারিণী সাবি-ঠাক(ণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাই। ওই ময়ূরা(ীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহারার দিন ময়ূরা(ীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরো শো বিয়াল্লিশ সালে দশহারার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চ্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি — ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরা(ীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাই। ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাল করে পূজো কর্ তারিণী, জল-টল হোক, বান-টান আসুক, বান না এলে চাষ হবে কি করে?

ময়ূরা(ীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পুজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী। ধর্ ধর্ কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল ধর্।

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভে উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল না।

পূজা অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেল। তারিণী মদ খাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড় — কলকল — বান, লে কেনে তু দশদিন বাদ।

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি তু কিন্তুক ভাষা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিন্তুক আমি ধরব, হ্যাঁ।

তারিণী মত্ত হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরণ-চাকে তিলেটি বুটবুটি, বুক— বুক— বুক, বাস্ — কালাচাঁদ ফরসা।

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল, কি বললি শালা?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিল। সে বলিল, ছোট বানের সময় — হুই পাকুরগাছ পর্যন্ত বানে দেওর ধরবে, আর পাকুরগাছ ছাড়লেই তুমি।

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলো লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ লইলেই বলে কে?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল, দুইজনে হাতুড়ি নেয়ান লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্য পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নুতন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাল ধরিল রৌদ্রের টানে। সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল না। বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল না। বৃষ্টি অতি সামান্য — দুই চারি পশলা। সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ত্র(ন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। কিংবা হয়তো বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসিক্‌ল ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়। সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে — তাঁহারা আসেন দেশে সত্যই অভাব আছে কি না, তাহারই তদন্তে। আরও কিছু মেলে — সে তাঁহাদের ফেলিয়া-দেওয়া সিগারেটের কুটি।

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছ্বল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু তিন দিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেল। গাছে বাঁধা ডোঙাটা তরঙ্গাঘাতে মৃদু দোল খাইতেছিল। তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়া ছিল — যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে তাহারই প্রতি(ায়, সে হাঁটিয়া পার হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুইজন মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারিণী বলিল, ই কি হল বল্ দেখি কেলে?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তো।

তারিণী আবার বলিল, এমন তো কখনও দেখি নাই।

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তো।

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনে — ফরস লী-ল পচি দিকেও তো ডাকে না।

কালাচাঁদ এবার উত্তর দিল, তাই তো।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া তারিণী বলিল, তাই তো! 'তাই তো' বলতেই যেন আমি ওকে বলছি। তাই তো! তাই তো! তাই তো!

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভেত মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদের সে দৃস্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিছু(ণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে লয় কেলে, পচি বইছে, না? বলিতে বলিতে সে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া শুষ্ক বালি একমুঠো ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বায়প্রবাহ অতি ীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল না। তবুও সে বলিল, হুঁ পচি থেকে ঠেলা বইছে — একটুকুন। আয় কেলে, মদ খাব, আয়। দু আনা পয়সা আছে আজ। বার করে লিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলে।

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারিণীর সঙ্গ ধরিয়া বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদা। বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেই। মলাম আমরাই।

তারিণী বলল, সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার।

'হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি' হয় ভাই। সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে—

বাধা দিয়ে কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল।

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলায় বসিয়াছিল, তারিণী প্র্ন করিল, কোথা যাবা যে তোমরা, বাড়ি কোথা?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দ্রপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমান।

কালাচাঁদ প্র্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি?

জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কিনা

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভি(যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল(জনমজুরের মধ্যে উপবাস শু(হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল কালাচাঁদ আসে নাই। প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল না। তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলে।

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাই। পাশের বাড়িতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িও শূন্য। শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্য। পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

হা(মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী, যাস না সব, যাস না। তা শুনলে না, বলে, বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করব।

তারিণী বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল(সে ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনি্বাস ফেলিল।

হা(আবার বলিল, দেশে বড়নোক কি আছে? সব তলা-ফাঁক। তাদের আবার বড় বেপদ। পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে পারে না। এই তো কি বলে — গাঁয়ের নাম, ওই যে — পলাশডাঙ্গা, পলাশডাঙ্গার ভদ্দরনোক একজন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। শুধু অভাবে মরেছে।

তারিণী শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! মাঠের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহে পড়িয়া ছিল। কতকটা তার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচি পরিবারের বৃদ্ধ মাতা এ হতভাগিনী। গত অপরাহে(চলচ্ছক্তি(হীনা বৃদ্ধার মৃত্যু-কামনা বারবার তাহারা করিতেছিল। বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্তবৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পালাইয়াছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, খান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন খাটুনি তো মিলবে।

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া কোন গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্র(করিল, আর?

সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে বল?

তারিণী গ্রাম ছাড়িল।

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিল। গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিল। তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখ, গামছাখানা। গামছাখানা লইয়া হাতে ঝুলাইয়া সেটাকে সে ল(্য করিতে আরম্ভ করিল। ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছে। সে সবিস্ময়ে প্র(করিল, ঘুমোও নাই তুমি?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না ঘুম এল না।

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ব্যামো-স্যামো হলে কী করব বল দেখি আমি? ই মানুষের বাইরে বে(নো কেনে বাপ, ছি-ছি-ছি!

বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস? ঝাড়া পশ্চিম থেকে।

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে— চকচক করছে।

তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কত(ণ? ওই দেখ্, কাকে কুটো তুলছে — বাসার ভামা-ফুটো সারবে। আজ এইখানেই থাক্ সুখী, আর যাব না(দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবে(ণ ভুল হয় নাই। অপরাহে(র দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ত্র(মশ প্রবল হইয়া উঠিল।

তারিণী বলিল, ওঠ্ সুখী, ফিরব।

সুখী বলিল, এই অবেলায়?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। লে, মাখালি তু মাথায় দে। টিপটিপ জল ভারি খারাপ।

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমার শরীর বুঝি পাথরের?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে, ই আমার জলের শরীর, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলে। চল্, দে, পুঁটুলি আমাকে দে।

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিল। উতলা বাতাসের সঙ্গে অল্প কিছু(ণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থাকে। কিছু(ণ পর আবার বাতাস প্রবল হয় সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি।

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিত্র(ম করিল দুই দিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া লদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখী।

প্রভাবে উঠিয়াই তারিণী ঘাটে যাইবার জন্য সাজিল। আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মত বাতাস সঙ্গে সঙ্গে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি।

দ্বিপ্রহের তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার বাড়ি চললাম আমি।

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছু।

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটা বড় গজাল খুলে গেইছে। সে না হ'লে — উহুঁ, অল্প বান হ'ল না হয় হ'ত, লদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে, দেখলে আয়।

সুখীকে না দেখাইয়া ছাড়িল না। পালদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরা(ীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, ডাক শুনছিল — সোঁ-সোঁ? বান আরও বাড়বে। তু বাড়ি যা, আমি চললাম। লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব না।

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জল ঝড়—

তারিণী সে কতা কানেই তুলিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে সে আসিতেছিল। কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না? হাঁ ডুগডুগিই বটে। এ শব্দের অর্থ তো সে জানে আসন্ন বিপদ। নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়।

তারিণীর গ্রামের ও-পারে ময়ূরা(ী, এ-পাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট্ট শাখা নদী। একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ। তারিণী সড়ক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল না। তবে পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেক(ণ পর ঠাহর করিল, যে পুলের মুখ এখন অন্তত এক শত বিঘা জমির পরে। ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডগায় ছিল জলের সীমা। দেখতে দেখতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মত গোঁ-গোঁ শব্দ। দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল। লাফ দিয়া মাটির পোকা পালাইয়া যাইতে চাহিতেছে।

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

(িপ্রগতিতে মাঠের জল অতিত্র(ম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গ(ছাগল ভেড়া কুকুর সে কি ভয়ার্ত চীৎকার। কিন্তু

সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরা(ীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ(লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহসেথর ত্র(ন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তারিণীর পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়। হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা, শেষ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সে বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল — অপরিমেয় আ(েস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিলে, এই যে, ঘরে আমি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণী দেখিল, ঘরের উঠানে এক কোমর জল। দাওয়ার উপর এক হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘর চাপা প'ড়ে মরবি যে।

সুখী বলিল, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াবে বল দেখি?

পথে নামিয়া তারিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি করি বল দেখি সুখী?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াও। সবার যা দশা হবে, আমাদেরও তাই হবে।

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?

তারিণী এ আ(াস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যার জল ছটকাইয়া দুলিয়া উঠিল। তারিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পড়ল সুখী। চল, আর লয়, জল কোমরের ওপর উঠিল, তোর তো এক ছাতি হয়েছে তা হ'লে।

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারীকণ্ঠের কাতর ত্র(ন্দন ধ্বনি উঠিল, ওগো খোকা প'ড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা রে!

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি, সুখী, ডাকলে সাড়া দিস।

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, কে? কোথা? কার ছেলে প'ড়ে গেল, সাড়া দাও ওই!

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যি।

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই!

কিছু(ণ ধরিয়া কণ্ঠস্বরে সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখী।

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ?

শব্দ ল(্য করিয়া তারিণী আসিয়া, বলিল, আমার কোমর ধর্ সুখী গতিক ভাল নয়।

সুখী আর প্রতিবাদ করিল না। তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কা'র ছেলে বটে? পেলে?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভূপতে ভল্লার ছেলে।

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিল। জল ত্র(মশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ সুখী। কিন্তু এ কোন্ দিকে এলাম সুখী, ই — ই —

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেল। পর(ণেই কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, নদীতেই বা পড়লাম সুখী। পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধ'রে ভেসে থাক।

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে — হু-হু শব্দে, তাঁহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরা(ীর বানের হুড়মুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মত। কুটার মত তাহারা চলিয়াছে — কত(ণ, তাহার অনুমান হয় না, মনে হয়, কতদিন কত মাস তাহার হিসাব নাই — নিকাশ নাই। শরীরও ত্র(মশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরা(ীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ত্র(মশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তারিণী ডাকিল, সুখী — সুখী?

উন্মত্তার মত সুখী উত্তর দিল, অ্যাঁ?

ভয় কি তোর, আমি —

পর মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল, জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি(পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছু(ণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মত জড়ায়িা ধরিতেছে? সে ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস — বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আত্রে(াশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আত্রে(াশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি(পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াচিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ — বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।

৪০.৫ সারাংশ

'তারিণী মাঝি' গল্পের গল্পাংশ সামান্য। গল্পের নায়ক তারিণী অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী। তার স্ত্রী সুখী। তারা নিঃসন্তান। তারিণী ময়ূরা(ী নদী সংলগ্ন গুনটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করে। তার এই কাজে একমাত্র সঙ্গী কালাচাঁদ। ডোঙায় লোকপারাপার করা শুধু তার জীবিকা নয়, এটি তার যেন নেশা। কিন্তু বর্ষার দিনের উত্তাল, ভয়াল ময়ূরা(ীর বুকে বেশী যাত্রী এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে অনেক। ময়ূরা(ী ভয়াল ভয়ঙ্কর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরেই তারিণীর মাঝি-জীবনের ভাগ্য নির্ভর করে।

নদী হিসেবে ময়ূরা ীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য নদীর মত সে আট মাস থাকে ম(ভূমির মত শুক্নো। কিন্তু বর্ষা এলেই সে হয় 'রা(সীর মত ভয়ংকরী।' তখন যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে অসম্ভব প্াবনে দুকূল অতিত্র(ম করে চতুস্পার্শ্বের গ্রাম, বাড়ী, ধনসম্পদ, লোকজন ভাসিয়ে দিতে পারে। জীবন হানি ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষের। গল্পের উপসংহারে দেখব এই ময়ূরা ী আর তারিণী বুঝিবা একই জীবন বৈশিষ্ট্যে আত্মীয়। ময়ূরা ী নদী জীবিকার সূত্রে তারিণীর জীবন ধারণে সাহায্য করে। তারিণীর আছে সুখীর মত স্ত্রী — নামেও স্বভাবে যে যথার্থই সুখজ। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় একটুকুও খাদ নেই। সমস্ত রকম ছোট-বড়, সুখ-দুঃখ বিপদের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্তভাবে আপন হয়ে থাকে। ময়ূরা ীর বুকে কারও বিপদ ঘটলে, জলে ডুবে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটলে, তারিণী নির্দ্বিধায় তাঁকে বাঁচায়। কেউ খুশী হয়ে যা দেন, তাতেই সে খুশী। টাকা, পয়সা, অলংকার, খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড় উপহার পেলে সে সব দিয়ে খুশী করে স্ত্রী সুখীকে। এভাবে সে নিজের সুখের জীবন ভরিয়ে রাখে।

কিন্তু ময়ূরা ীর জীবন সব সময় সমান তালে চলে না। এক সময় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে তারিণীর পেশা বন্ধ হয়ে যায়। তারিণীর কষ্টের শেষ থাকে না। খাদ্যের অভাবের সঙ্গে আশপাশের গ্রাম মড়ক লাগে। গ্রাম ছেড়ে সব পালাতে থাকে। শেষে তারিণী আর সুখীও গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ময়ূরা ীর মাঝি, তারিণী। সে হাওয়ার গতিক বোঝে। বুঝতে পারে বর্ষা আসন্ন। সুখীকে নিয়ে যে ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখে। সত্যিই যখন আবার বর্ষার মেঘ এলো ও তা থেকে ঘনবর্ষণ হোল, তারা বাড়ী ফেরাই স্থির করল এবং পরিশেষে ফিরে আসে। ত্র(মশ আকাশের অবিরাম বর্ষণ আর নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে প্াবিত করে। বাড়ী ঘরদোর গ(বাছুর মানুষ বন্যায় বিধ্বস্ত ও ডুবে যায়। তারিণী আর সুখীও তাদের ভাঙা ঘর-বাড়ি ছেড়ে নদীর বুকে প্রতিকূল অবস্থায় ভাসতে থাকে। শেষে উভয়েই অবধারিত জীবন-সংশয়ের কালে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সুখী তাকে আঁকড়ে থাকে। তারিণী এই সংকটে, বাঁচবার একান্ত আকা ায়, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে জড়িয়ে থাকা, তাঁর একান্ত ভালবাসার, একমাত্র আপনজন — স্ত্রী সুখীর বজ্রমুষ্ঠি থেকে মুক্তি(পাবার জন্য তাঁর গলা টিপে শ্বাস(দ্ধ করে, নিজেকে বাঁচাতে স(ম হয়। আলো আর মাটির আশ্রয়ে তারিণী বুক ভরে শ্বাস নেয়। গল্প এখানেই শেষ হয়েছে।

৪০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পের একটি কাহিনী আছে, কিন্তু তার গল্পাংশ কম। গল্পটি গড়ে উঠেছে দুটি চরিত্রকে আশ্রয় করে — তারিণী আর সুখী। এর সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে একটি চরিত্র ময়ূরা ী নদী। ময়ূরা ী লেখকের বর্ণনার গুণে ও তাঁর প্রকৃতি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিল্পীর প্রয়াসে নদীটিও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনীবৃত্ত ছোট। উপস্থাপনা সংযত। গল্প পূর্বাপর শিল্পের শাসনে নির্মেদ ও সংহত। গল্পের শু(তারিণীর কথায় — সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের ঘটনা দিয়ে। শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে, তারিণীর নিতান্ত আত্মর(ার চিত্র রচনায়। কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গল্পাংশে রক্ত(মাংষ জুগিয়েছে।

৪২৪

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে যে, মানুষের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত

হয়ে থাকা কোনো একটা আদিম প্রবৃত্তি সহসাই কালসর্পের মতো ফণা তুলে কাহিনীর ট্রাজিক পরিণামকে সূচিত করে। 'তারিণী মাজি' এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে। অনেক সময়ই অবশ্য তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রধান কোনো চরিত্রের মধ্যে ঐ ধরনের জৈবিক বৃত্তির সন্ধান পূর্বাপরই মেলে(সেই সব (ে ত্রে নিয়তির চূড়ান্ত আঘাতটি কাহিনীর পরিশেষে বজ্রের মতো আছড়ে পড়লেও, তার প্রস্তুতিটা অনেক আগে থেকেই অনুভব করা যায়, হয়ত বা নিজেরও অগোচর-অবচেতনের মধ্যে। এই ধরনের কাহিনী হল 'অগ্রদানী', কিংবা 'আখড়াইয়ের দীঘি', অথবা 'বেদেনী'। আর 'তারিণী মাঝি'-র সঙ্গে পংক্তি(ভুক্ত(হতে পারে 'দেবতার ব্যাধি'-র মতো গল্প।

'তারিণী মাঝি' গল্পের বিষয়-উপকরণের সঙ্গে বীরভূমের নিসর্গপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এটা অবশ্য তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই দেখি। কিন্তু 'তারিণী মাঝি' গল্পের (ে ত্রে এই ব্যাপারটি একটু ভিন্নতর মাত্রিক। গণুঘাটের খেয়ানৌকোর মাঝি তারিণী এবং তার স্ত্রী সুখীর মতোই প্রবল বন্যায় হিংস্র হয়ে ওঠা ময়ূরা(ী নদীও এই কাহিনীর অন্যতম একটি প্রধান চরিত্র। বস্তুতপ(, তারিণী, সুখী এবং ময়ূরা(ী — এই তিনটি চরিত্রই বলা যেতে পারে সমান গু(ত্বপূণল। মানুষের মনের অবচেতনে তলিয়ে থাকা যে-সব প্রবণতা আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে পারিপার্শ্বিকের অপ্রতিরোধ্য প্ররোচনায়, তাদেরই একটি — আত্মর(ার সহজাত বৃত্তি — এই কাহিনীর ট্র্যাজেডির মূল উপল(। ঐ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের প্ররোচনা এখানে এসেছে ময়ূরা(ীর বিধ্বংসী বানের মূর্তিতে, কাহিনীর ভিলেন হয়ে।

গণুঘাটের খেয়ামাঝি তারিণী(তার সহকারী হল কালাচাঁদ। ময়ূরা(ীর বুকে এপার-ওপার করে তারা নৌকা বোঝাই যাত্রী নিয়ে। তাদের দেওয়া 'পারের কড়িতে'-ই তারিণীর গ্রাসাচ্ছাদন। এর ওপরে কখনো - কখনো জোটে ডুবন্ত মানুসজন, গ(মহিষকে বাঁচানোর বকশিস্ ঃ টাকা, কাপড়, কখনো টুকিটাকি গয়নাগাঁটিও। পুত্রবধূকে জলে ডোবা থেকে র(া করার পুরস্কার স্বরূপ কোনো বর্ধিষু(গৃহস্থ হয়ত দেন টাকা(বরাত থাকে পরবর্তী দশহরার সময় ধুতি-চাদরের। সলজ্জভাবে তারিণী চাদরের বদলে হয়ত চেয়ে নেয় ব(য়ের জন্য নতুন শাড়ি। তারিণীর হাতে হয়ত জলে-পড়ে যাওয়া কিশোরী বধূটি তুলে দেয় নিজের নাকেরই সোনার নথটুকুই। একখানা 'ফাঁদি লত্''-ও ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়েছিল তারিণী তার সুখীর জন্যে।

এইসব ছোটখাট ঘটনাগুলিই তারিণী-সুখীর দাম্পত্য সুখের নির্দেশিকা। সন্তানহীনতার বেদনা আছে তাদের, কিন্তু সেটা গ্রাস করে ফেলেনি তাদেরকে। মদ খায়, কালাচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে, আবার সুখীর শাসন মেনে খুশিও থাকে তারিণী। এইভাবেই দিন কাটে তাদের।

রাঢ়বাংলার প্রবল খরায় কোনও একবার দেশজুড়ে হাহাকার পড়ে। ময়ূরা(ীর বুকে চড়া পড়ে মাইলের পর মাইল। খেতখামারে ফসল নেই। গরিবগুর্বোর ঘরে খাবার নেই। গ্রামের পর গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ছে — স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে মানুষ চলছে শহর অভিমুখে, কাজের সন্ধানে। একদিন নি(পায় হয়ে তারিণীও বেরিয়ে পড়ে সুখীর হাত ধরে ঃ ''দিন-খাটুনি তো মিলবে।''

কিন্তু ক-দিনের মধ্যেই নদীতে প্রবল বান আসার সঙ্কেত পায় ময়ূরা(ীর 'সন্তান' অভিজ্ঞ খেয়ার মাঝি তারিণী। তিনদিনের পেরিয়ে-আসা পর নবোদ্যমে ফিরে আসে সে বউকে নিয়ে। আসন্ন বর্ষায় টইটম্বুর হয়ে নদী আবার তাকে ফিরিয়ে দেবে জীবিকা, মনের নিশ্চিন্ততা, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল একসময়ে বিস্তীর্ণ লালমাটির দেশ।

অবশেষে বানও এক সময়ে এল — তার ''বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন।'' নদীর বুকে ডুগডুগি বেজে উঠে আসন্ন বিপদের ইশারা দিলে গেল। গ্রামের মধ্যেও বান ঢোকে— ভাসতে থাকে বাড়ির চালা, গ(র-বাছুর, মানুষ। বন্যার প্রবল শব্দ, ঝড়বাদলের প্রবল ঝাপ্‌টা আর মানুষ ও পশুর ভয়ার্ত চেঁচামেচিতে যেন বি(েজগৎ ভরে যায়।

মায়ের বুক থেকে খসে-পড়া ভূপতি ভল্লার সন্তানকে এর মধ্যেই উদ্ধার করে তারিণী। কিন্তু জল ত্র(মশই বাড়তে থাকে(সুখীকে পিঠে নিয়ে সাঁতার দিতে শু(করে সে — জীবনের সহজাত আত্মর(ার আকুতিতে। কিন্তু অথই জলের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য কমে আসে বহু বচরের ময়ূরা(ী — অভিজ্ঞ তারিণী মাঝিরও। তারিণী 'অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি(পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছু(ণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখী — তারিণীর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল যে সুখী তার নি(পায়, অসহায় হাতদুটোর নাগপাশের মতো বলে মনে হচ্ছে জীবনের বৃহত্তম বন্যার মধ্যে বিপন্ন হওয়া তারিণী মাঝির। একটা সময়ে, প্রাণাধিকা সুখীর ঐ ভয়ার্ত বন্ধনই তার কাছে প্রতীত হল অনিবার্য মৃত্যুফাঁস রূপে! মুহূর্তের মধ্যে প্রেমকে, হৃদয়াবেগকে নিশ্চিহ্(করে ''দুই হাতে প্রবল আত্রে(াশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল!'' .... সুখীর মৃতদেহ তলিয়ে গেল একটু পরেই — জলের উপর ভেসে উঠে বুক ভরে বাসাত টেনে তারিণী পেতে চাইল — ''আলো ও মাটি।''

এই হল এ-কাহিনীর পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান — যদিও সং(প্ত, কিন্তু বি(প্ত নয়। দুটি মানুষের নিবিড় আত্মিক বন্ধনও যে জীবনার্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই নির্মম নিষ্ঠুর সত্যটিকে এইভাবেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন তারাশঙ্কর।

৪৩৪

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কয়েকটি মৌল ঈপ্সার কথা হামেশাই বলে থাকেন। (ুধা, যৌনবাসনা এবং আত্মর(ার সহজাত তাড়না — এই তিনটিই হল সেই সব মৌল ঈপ্‌সার (Basic urge) মধ্যে প্রবল। এদের মধ্যে আবার প্রবলতম কোন্‌টি তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের ঐক্যমত ঘটতে দেখা যায় না বিশেষ। তারাশঙ্করের এই কাহিনী হয়ত বা সেই বিতর্কের একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ দিতে পারে।

অধ্যাপক ফ্রয়েড এবং তাঁর চিন্তানুসায়ী মনোবিদ্‌রা বলে থাকেন যৌনবাসনাই হল প্রবলতম অভী(া মানুষের জীবনে। পরিশীলিত হয়ে সেটাই প্রেমে রূপান্তর লাভ করে এবং জীবনের সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয় তার প্রত্য(বা পরো(প্রণোদনায়। প্রত্য(-পরো(প্রেম যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেও অল(্যসঞ্চিত যৌন-অভীপ্সাই নিয়ন্ত্রণ করে সব কিছু — এমনই সিদ্ধান্ত ফ্রয়েডপন্থীদের।

কিন্তু (ুধা এবং আত্মর(ার তাড়নাই (বহু(ত্রেই এই দুই ঈপ্‌সা আবার পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে) সম্ভবত প্রবলতর — কামনা (বা প্রেম) তাদের তুলনায় শেষ বিচারে পিছিয়ে পড়ে। যে সুখী ছিল তার ধ্যানজ্ঞান, যার আনন্দবিধানের জন্য সে মানুষের পরিহাস-বিদ্রূপও গায়ে মাখেনি, রাত-

দুপুরে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেও সে যে সুখীর গায়ে হাত না তুলে (যা তার সমতুল্য আর পাঁচটা কঠিন - শ্রমজীবী মানুষের প(ছিল একান্তই স্বাভাবিক) তাকে নিয়ে গান গেয়ে, গয়না পরিয়ে আ(াদ করেছে — নিজের প্রাণটুককে র(া করার সহজাত প্রবণতার পথে যখন নদীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সেই সুখীই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন নিজেকে বাঁচানোর জৈবিক প্রণোদনায় তারিণী তাকেও 'দুই হাতে সুখীর গলা পেষণ করিয়া' হত্যা করে নিজের নিরাপত্তা সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছে। অন্ধ আত্মর(ার তাড়নাই তার কাছে তখন সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে প্রেম-নারী-সংসার-গৃহ-দাম্পত্য — সমস্ত কিছু সেই ভয়াল মৃত্যুর বিভীষিকার সামনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশিষ্ট থেকেছে শুধুমাত্র ব্যাকুল জীবনাতিটুকুই। সুখীর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্যান্য সমস্ত মানবিক বৃত্তি এবং আকাঙ্গ্রাগুলিও তলিয়ে গেছে বানভাসি ময়ূরা(ীর বুকে মৃত্যুফাঁদস্বরূপ জলের অতলস্পর্শী ঘূর্ণির গহ্বরে।

অথচ, এই মানুষটির স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল বিপন্ন মানুষকে (এমন কি অবলা পশুকেও) জল থেকে তুলে আনার — প্রায়শই সেটা বিনা লোভেই। ঘোষবাড়ির কিশোরী বউটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচানোর পরে পুরস্কার হিসেবে প্রথমে সে চেয়েছিল মাত্র আট আনা পয়সা — এক বোতল দেশি মদের দাম — তারপরে সাবি প্রমুখের তাগিদে তার হুঁস হয়েছে দামী কিছু চাওয়া যেতে পারে বলে। পাঁচ টাকা বকশিস পেয়ে, তার থেকে দু-টাকার সে অকাতরে দান করে দিতে পারে 'কেলে'-কে — সে ঐ উদ্ধারের কাজে আদৌ কোনো সহায়তা না করলেও! সুখীকে মেরে ফেলবার সামান্য কিছু আগেই সে তো ঐ বিপর্যয়ী প-াবনকে অগ্রাহ্য করেই জলে পড়ে যাওয়া শিশুকে নিজের প্রাণের মায়া না রেখে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে তার মায়ের কোলে। সেখানে তো পুরস্কার-পার্বণীর কোনো দূরতম হাতছানিও ছিল না।

৪৪৪

প্রকৃতির দুই রূপ ঃ হনাত, সমাতি এবং প্রলয়ঙ্করী। ময়ূরা(ী যখন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে, তখন মানুষের মধ্যেও সেই ধীরতোয়া শান্ত ভাবটিই দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। তখন তারিণীও খেয়াযাত্রীদের নিয়ে পরিহাস করে, মায় কালাচাঁদও। যাত্রীরাও করে। সেই রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-গল্প ইত্যাদির পরিপ্রে(ত পাল্টে যায়, যখন প্রবল খরায় সমস্ত এলাকাটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির নির্মম নিষ্ঠুরতা মানুষের পেটের ভাত, মাথার ছাদ এবং মুখের হাসি সবই কেড়ে নেয় তখন। এরপরে প্রকৃতি যখন ভয়ালতর রূপ ধরে বিধ্বংসী বন্যায়, তখনও মানুষের মানবীয় বৃত্তিগুলি প্রারম্ভিক ভাবে সচেতন থাকে (ভূপতে ভল্লার ছেলেকে তারিণীর নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঁচানো যার প্রমাণ), কিন্তু তারপরেই সংকট যত বাড়ে মানুষ আর সব ভুলে যায় — তর সমস্ত অস্তিত্ববোধ টিকে থাকে আদিম এবং হিংস্র মানসিক প্রবৃত্তির কাঠামোর ওপরে ভিত্তি করে, আত্মর(ার জন্য সে তখন পশুর মতো নৃশংস (সুখীর হত্যা যার নির্দশন)।

প্রকৃতি এবং মানুষের এই বিচিত্র পারস্পরিকতাকেও এই কাহিণীর মাধ্যমে সুনিপুণভাবে প্রতিবেদিত করেছেন তারাশঙ্কর। বীরভূমের মানুষ এবং প্রকৃতি — দুইই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় — খরা, বন্যা ইত্যাদিকে যেমন তিনি আপন অভিজ্ঞতার তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন, ঠিক একইভাবে ময়ূরা(ী পারের গ্রামীণ মানুষগুলিকেও বাস্তব করে তুলেছেন।

'তারিণী মাঝি' গল্পের এই বাস্তবধর্মিতারও একটি বিশেষ মাত্রা আছে। জীবনের নির্মম রূপটিকে এই কাহিনীতে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাকে রিয়ালিজম বলার চেয়ে ন্যাচারালিজ্‌ম বলাই হয়ত বেশি

বাঞ্ছনীয়। রূঢ় বাস্তবকে কোনো পেলব আস্তরণে না-মুড়ে, মানুষের মনের আদিম জান্তবতাকে যেভাবে এই গল্পে উন্মোচিত করা হয়েছে তাকে সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় ন্যাচারালিশ্‌টিকই বলতে হয়। তবে এভাবে সীমানাবদ্ধ করে একটি সৃষ্টির কুলপ্রতীক নির্দেশ অবশ্য সাম্প্রতিককালে বিশেষ আর করা হয় না। আসলে কাহিনীর এই আচম্বিত পরিণামের ফলশ্রুতিতে 'তারিণী মাঝি' একটি বন্দেজী ছোটগল্প বলে যেমন পরিগণ্য হয়, তেমনই আবার এই পরিণামেরই প্রে(তে এটিকে গ্রিক ট্রাজেডি-সুলভ 'হ্যামার্তিয়া' জনিত নিয়তি নির্দেশের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিও হয়ত বা বলা যায়।

৪৫৪

অধ্যাপক (ত্র গুপ্ত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই গল্পটি সম্বন্ধে। তিনি লিখছেন ঃ ''স্বয়ং লেখক বহুকাল পরে গল্পটিকে আবার স্মরণ করেছিলেন। প্রবন্ধে স্মরণ নয়, কাহিনীতে স্মরণ — একরকম রি-মেক। বার্ধক্যে 'বিচারক' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি নিজের পরিণত যৌবনকালকে তার ভাবনা-চিন্তা-বি(াসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই তারিণী মাঝি লেখককে ভিতরে ভিতরে ভুগিয়েছিল অনেক বছর। অথবা তারিণী শুধুই উপল(। ওঁর অনেক গল্পই এই যন্ত্রণার উৎস হয়ে উঠেছিল। নিজের সৃষ্টি যখন তাড়া করে সে বড় কঠিন পলায়ন — নিজের কাছ থেকে বলেই না।'' (তারাশঙ্কর ঃ অনুসন্ধান '৯৮ / ১৯৯৮(পৃঃ ১২৮)

(ত্রবাবু যে মনোকূটের ইঙ্গিত করেছেন, তার বিস্তার গভীরপ্রসারী। 'বিচারক' উপন্যাসের নায়ক তাঁর প্রথমা স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব — অন্ততপ(নিজের মনের গভীরে অস্বীকার করতে পারেন নি। পরবর্তী সমস্তটা জীবনের প্রতিটি চেতন-মুহূর্তে তাঁকে সেই দায়িত্বচ্যুতিজনিত অপরাধবোধ যেন এক অনির্দেশ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। তারিণী একান্তভাবেই জৈবিক এক প্রবৃত্তির অমোঘতার বশে প্রিয়তমা পত্নীকে হত্যা করে নিজের প্রাণ র(া করেছে — আসন্ন মৃত্যুঘূর্ণির ভয়াল নাগপাশবন্ধন থেকে রেহাই পেয়ে সে খুঁজেছে বাতাস, আলো, মাটি। গল্পে তো ঐখানেই শেষ(পরবর্তী সময়ে তারিণী তার ঐ আচম্বিত অপরাধের গ্লানিতে জর্জর হয়েছে কি-না, গল্পকার তা আর জানাননি(জানালে গল্প আর 'ছোটগল্প' থাকত না, হয়ে উঠত উপন্যাস। কিন্তু ঔপন্যাসিক ঠিক সেইটিই করেছেন। ফলত, সে জিজ্ঞাসা অনিরসিত থেকে গেছে এই গল্পে, তাকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যান করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ঐ উপন্যাসে। গল্পেতে যা ছিল আংশিক, উপন্যাসে সেটাই হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ। একটু পার্থকয অবশ্য আছে ও-দুয়ের মধ্যে — প্রেমের প্রতিমা হওয়া সত্ত্বেও জীবনসঙ্গিনী সুখীকে তারিণী হত্যা করেছে এক লহমার মধ্যে, নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে। আর 'বিচারক'-এর নায়ক তাঁর প্রেমহীন জীবনসঙ্গিনীকে উদ্ধার করেন নি আগুণের মৃত্যুফাঁদ থেকে — হয়ত এভাবেই তিনি রেহাই পেতে চেয়েছেন জীবনের নিষ্ক(ণ অপ্রেম থেকে, অবচেতন বিতৃষ(ার প্ররোচনায়। তারিণীর কাছে যা ছিল চেতনালুপ্ত সহজাত এক জৈবিক অভী(া, 'বিচারক'-এর হাকিম সাহেবের কাছে সেটাই ছিল অবচেতন (না-কি, চেতন?) একটি গূঢ় কুটিল মনোকূট। তাই গল্প এবং উপন্যাস — দুয়ের মধ্যে সমধর্মিতা যতটাই থাকুক, বৈষম্যও কিছু কম নয়।

আসলে তারিণীর সত্তার অন্তর্গত বিচিত্র বৈপরীত্যের টুকরো-টুকরো ইঙ্গিত দিয়ে তার পরিপূর্ণ রূপটিকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন গল্পকার। সে পত্নীপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, অকুতোভয়, পরিশ্রমী, এবং নেশাখোর, অহঙ্কারী, কটুভাষী(আবার পরিহাসপ্রিয়, বিনয়ী উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সঙ্গেই দায়িত্বশীল,

সরল, সৎ ও নির্লোভ। এত ধরনের বৈপরীত্য-সাদৃশ্যের সমাহারেও তার চরিত্রটি কিন্তু দুজ্ঞেয় হয়ে ওঠেনি। তাই কাহিনীর শেষ পরিণামে যখন তার প্রেম ও দায়িত্ববোধকে সে আ(রিক অর্থেই গলা টিপে মেরে আত্মর(ার আদিমতম প্রবৃত্তিকে যখন উদ্‌ঘাটিত করল আজীবনের সুপ্তি-আচ্ছন্নতাকে এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে — তখন সেই আচম্বিত পরিণতি পাঠকের মনকেও বিমূঢ় করে তোলে। এরই মধ্যে গল্পটির শিল্প-পরিণাম আত্মপ্রকাশ। করেছে। তারিণীর অবচেতনের ঐ আদিম হিংস্রতাকে উচ্চকিত করেছে বন্যায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা ময়ূরা(ী নদীও। আর সমস্ত বিবাহিত জীবনভোর যে তাকে লতার মতো অবলম্বন করে বেঁচে থেকেছে নির্ভয় নিশ্চিন্ততায়, সেই সুখী — তার বউ — অতলজলের মধ্যে হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল ঐ চিরাভ্যস্ত নির্ভরতারই পরিণামে। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে তাই 'তারিণী' এবং 'সুখী' নামদুটি যেন নির্মম পরিহাসের প্রবল নির্ঘোষে ধ্বনিত হয়ে গল্পের ট্রাজিক পরিণতির মধ্যে সৃষ্টি করল একটি অকল্পনীয় বৈপরীত্যের মাত্রা।

৪০.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) যে-সুখী, তারিণীর কাছে পৃথিবীতে একান্ততম প্রিয়জন ছিল, নিজের বাঁচবার তাগিদে তাকেই সে হত্যা করে বসল — এই কাহিনী পরিণাম কতখানি স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য বলে মনে হয়?

২) ''তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মানুষের মনোগহনের আলো-আঁধারিতে সন্ধিৎসু অভিযাত্রিক।'' — 'তারিণী মাঝি' গল্পটির বি(-ষণ করে এই বক্ত(ব্যের যৌক্তি(কতা কতটা, বিচার কর।

৩) রাঢ়-বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের যে গভীর পরিচয় ছিল, 'তারিণী মাঝি' গল্পে তা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখাও।

৪) 'বিচারক' উপন্যাস এবং 'তারিণী মাঝি' গল্প — দুয়ের কাহিনী-কাঠামো মোটামুটি একই ছাঁচের হলেও, ভাবপরিণামে দুটি পৃথক হয়েছে কেন এবং কীভাবে, বল।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ময়ূরা(ীতে আসন্ন বন্যার সংকেত কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল?

২) ময়ূরা(ীর বন্যার ফলে পারিপার্শ্বিক এলাকার চেহারা কেমন হয়?

৩) তারিণী-সুখীর দাম্পত্যজীবন কীভাবে কাটত?

৪) ''ময়ূরা(ীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব'' কীভাবে হয় না?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) ঘোষবাড়ির বধূটি জলে পড়ে গিয়েছিল কবে?

২) 'তারিণী মাঝি' গল্পের ঘটনাকাল কোন্ বছরের?

৩) বৃদ্ধা যাত্রিণীটি সাবিত্রীকে কীভাবে হাসতে বারণ করেছিলেন?

৪) যে বানের জলে ডুবে সুখীর মৃতুয হয়, তেমন বানের নাম কী?

৫) কত বছর আগে শেষবারের মতো সেই বান এসেছিল ময়ূরা ীতে?

৬) তারিণী ‘‘ফাঁদি লত’’ বখশিস পাবার পর সাবি তাকে কী শুধিয়েছিল?

৭) তারিণীর খেয়া নৌকা কোথা থেকে কোথায়-কোথায় পাড়ি দিত?

৮) মদন গোপ তারিণীকে কেন বখশিস দিয়েছিলেন?

৯) কেষ্ট দাসের বাড়ি কোথায় ছিল?

১০) সুখীর কানের ফুল কীভাবে হয়েছিল?

১১) বর্ধমানে যারা মজুর খাটতে যাচ্ছিল, তারা কোন্ গাঁয়ের লোক?

১২) কার ছেলেকে তারিণী বাঁচিয়েছিলেন বন্যার জল থেকে?

৪০.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশের শেষাংশ ও তৃতীয় অংশের প্রথমার্থ অবলম্বনে উত্তর তৈরী ক(ন।

২) মূলপাঠ এবং আলোচনা পঞ্চম অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

৩) মূলপাঠ এবং আলোচনা চতুর্থ অংশের সহায়তায় উত্তর ক(ণ

৪) আলোচনার শেষাংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পের শেষাংশ যেখানে খেয়ামাঝি তারিণী ল(্য করেছে পশ্চিমা বাতাস বওয়া, কাকের কুটো সংগ্রহ, টিপ্‌টিপ জল প্রভৃতি। এ থেকে সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। — এর সাহায্যে উত্তর ক(ন।

২) গল্পের শেষাংশে বন্যার জল প্রবল বেগে প্রবেশের যে বর্ণনা আছে তার সাহায্যে উত্তর তৈরী ক(ন।

৩) মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে উত্তর দিন।

৪) মূলপাঠ-এ গল্পের প্রথমাংশে তারিণী-সুখীর সংলাপে এ পরিচয় আছে। এই অংশের সাহায্যে উত্তর প্রস্তুত ক(ন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য রচনা করে উত্তর দিন।

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় — *শ্রেষ্ঠ গল্প (সম্পাঃ জগদীশ ভট্টাচার্য)*

২) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রথম সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*

৩) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ড. (েত্র গুপ্ত — *তারাশংকর অনুসন্ধান '৯৮*

৫) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৬) ড. সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ শততম বর্ষাপন*

৭) ড. পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ আলোকিত দিগ্বলয়*

৮) ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় — *এক আকাশ দুই ন(ত্র*

৯) ড. নিতাই বসু — *তারাশংকরের শিল্পীমানস*

১০)

একক ৪১ ❑ সুবোধ ঘোষ ঃ সুন্দরম্

গঠন

৪১.১ উদ্দেশ্য

৪১.২ প্রস্তাবনা

৪১.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৪১.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

৪১.৫ সারাংশ

৪১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৪১.৭ অনুশীলনী

৪১.৮ নির্ধারিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪১.৯ উত্তর সংকেত

৪১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কথা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আভির্ভাব চল্লিশের দশকে। দেশের আকাশ-বাতাসে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোছায়া। — রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের উঠানেও এসে সে প্রবল আঘাতে আঘাতে সমস্ত কিছুকে ভাঙচুর করছে। বাংলা সাহিত্যের এর প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। সুবোধ ঘোসের রচনাও এর ব্যতিত্র(ম ছিল না। এতদিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের পাতার গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করলেও নিজে কোন গল্প লেখেন নি। তাঁর গল্প লেখার সূচনা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ‘অনামী সংঘের’ সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের প্রেরণায় ‘অযান্ত্রিক’ ও ‘ফসিল’ দুই স্মরণীয় রচনায়। বন্ধুদের দ্বারা তো বটেই ‘আনন্দবাজার বার্ষিকী ও ‘অগ্রণী’ প্রত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দ্বারা বিপুল অভিনন্দিত হয়েছে। ছোটগল্প গ্রন্থ ‘ফসিল’ (১৯৪০)-এর পরে সংকলিত হয়। এই ‘ফসিলে’রই অন্যতম রচনা — ‘সুন্দরম্’-এ পূর্বেই রচিত।

‘সুন্দরম্’ গল্পটি পাঠ করে আপনি সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার কতকগুলি সাধারণ ল(ণের সঙ্গে তাঁর মানবচরিত্র অধ্যয়নের অসামান্য কৃতির পরিচয় পাবেন। সেগুলি হোল —

১) গল্পটিতে আপনি লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।

২) বুঝতে পারবেন চরিত্রপ্রধান এই গল্পটি লেখক মনোবৈজ্ঞানিকের গভীর দৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন।

৩) গল্পের নাম ‘সুন্দরম’। লেখক সম্ভবত সৌন্দর্যতত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা দেবার জন্যই এ নামকরণ করেছেন।

৪) পুত্রের বিবাহের যোগ্য পাত্রী সন্ধানকালে নারীর প্রতি যে নির্মম অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে, তার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র এ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

৫) মধ্যবর্গীয় কৈলাস ডাক্ত(ারের পরিবার এবং অবরবর্গীয় তুলসী-যদু-নিমাই শ্রেণী বিভাজিত সমাজে এদের স্বতন্ত্র অবস্থান। আর্থ-সামাজিক ভিত্তিও স্বতন্ত্র। শেষোক্ত(শ্রেণীর প্রতিভূ যদুর গল্পের শেষ বাক্যটি যে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৬) সুকুমার চরিত্রের অস্বাভাবিক আচরণ — আশৈশব নিরামিশ ভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম অভ্যাস অনেকটা বাতিকে পরিণত হয়েছিল। এ হেন স্খলন-পতন অপ্রত্যাশিত হলেও অনেকটা নিয়মিত মতই অনিবার্য ছিল। গল্পের শেষ পরিণতি, এক দিক থেকে ট্র্যাজিক হলেও কতটা বাস্তব তা বুঝতে পারবেন।

৪১.২ প্রস্তাবনা

মহৎ প্রতিভার আশ্রয়ে পুষ্ট ত(ণ প্রজন্ম নতুনতর কিছু করার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁদের ভাবনা চিন্তা অনেকটা বিপন্ন বোধ করে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু প্রথম বি(েযুদ্ধকালে ত(ণ লেখকদের মনে যে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে অসহিষ্ণু(তা এবং বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেধেছিল, তা থেকে মুক্তি(র আকাঙ্খা — তাঁদের সে সময়ের গল্প উপন্যাসে স্পষ্টত পাওয়া যায়। এ সময়ের বিপন্ন, বিরক্ত(লেখকরা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রে বি(েসাহিত্য সংস্কৃতি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিক্রি(য়ার বর্ণনায় কিছুটা প্রভাবিত হলেও বস্তুত সোভিয়েত বিপ-বের শু(ও সাফল্যে তাঁরা যেন নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছিলেন। নতুনতর ভিন্নতর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। কল্লোলের লেখকদের রচনায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের ও সমকালীন মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন চল্লিশেক দশকের কথাসাহিত্যিকদের নতুনতর পথের দিশা নিয়ে আসে। সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের এই সূচনা পর্বে। বাংলার নতুন প্রজন্ম এ সময় নতুন যুগের নতুনতর ধ্যান ধ্যারণায় ছিল উদ্বেল। তাঁরা ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউটের ছত্র ছায়ায় নতুনতর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরী করছেন। সুবোধ ঘোষের গল্প ‘ফসিল’ অবলম্বনে ‘অঞ্জনগড়’ নাটক অভিনীত হচ্ছে। জার্মানীর ফ্যাসিস্ট শক্তি(র বি(দ্ধে সংগ্রামের জন্য বি(েের নানা দেশের লেখক-শিল্পীরা একত্রিত হয়ে সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারের সঙ্কল্প নিচ্ছেন। শহরের সর্বত্র বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে শিল্পী সাহিত্যিকরা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্কট উত্তরণের স্বপ্ন দেখছিলেন। ফসিল সেই স্বপ্নের ‘ফসল’। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ হাত ধরাধরি করে সমাজের ধারক সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পেষণ করে। তেমনি এক (য়িষ্ণু(সামন্ত সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বের পরিচয় তুলে ধরে রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক সুবোধ ঘোষ এই গল্পে। ‘সুন্দরম’ গল্পে এর সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে, মনস্তত্ত্বের অতি গূঢ় কিছু বি(-ষণ।

সুবোধ ঘোষের লেখায় বিশিষ্ট উপকরণ হল মনোবিকলন। সেটা কেবলমাত্র সমাজের শি(ি ত মধ্যবর্গীয় মানুষদের (েত্রেই নয়, অন্যতর স্তরের মানুষেরও মনের গভীরে তিনি প্রবেহ করেছেন তাঁর সুবিপুল অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গেই। ন্যায় ও অন্যায়, নীতি ও নীতিভ্রংশতা, সঙ্গত ও অসঙ্গতর সীমারেখা যে বহু সময়েই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, এই সুকঠিন সত্যটিকে তিনি বহুভাবে উদঘাটিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে সুবোধবাবু অন্বেষর করেছেন। দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত(অথচ স্থিতপ্রজ্ঞভাবে। দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্য তিনি প্রথম বয়সে পেয়েছিলেন। হয়ত সেটাই তাঁর এই স্থিতধী দ্রষ্টা রূপে শিল্পীসৃষ্টির অন্তরী(ে ছিল।

'সুন্দরম' সুবোধ ঘোষের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির অন্যতম। শুধুমাত্র এইটুকু বললে হয়ত এর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেওয়া যাবে না, কারণ যদি কেউ এটিকে বাংলাসাহিত্যের সেরা গল্পগুলির বর্গভুক্ত(করেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হওয়া খুব কঠিন। জীবনের নির্মম কিছু সত্য-উপলব্ধি এবং সামাজিক-অপহ্নতকে অবলম্বন করে এই গল্প তৈরি করা হলেও, এর মাধ্যমে যে রূঢ় ব্যঙ্গকে উন্মোচিত করা হয়েছে, তার শিল্পগত মূল্যও কিন্তু খুব কম নয়। নৈতিক মূল্যবোধগুলির কীভাবে এই জটিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে অব(য় ঘটে যে, তারও এক সুতীব্র উদঘাটন হয়েছে এই গল্পে। গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বর্তমান আলোচনার যাথার্থ ও গল্পের রসাস্বাদন করতে পারবেন।

৪১.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

সুবোধ ঘোষের জন্ম বিহারের হাজারিবাগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর (মৃত্যু ১০ই মার্চ, ১৯৮০) তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র ও মা কনকলতা। তাঁদের আদি নিবাস অধুনা বাঙলাদেশের ঢাকা জেলার বিত্র(মপুরের 'বহর' গ্রামে। সতীশচন্দ্র কর্মব্যাপদেশে বিহার প্রবাসী হন। তিনি সরকারী জেলের অধঃস্থন কর্মচারী ছিলেন। সুবোধ ঘোষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের সহকারী প্রধান শি(ক বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্য ও তাঁর ব্যক্তি(গত গ্রন্থাগারে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি হাজারিবাগ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারি বাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সহাধ্যায়ী বন্ধুর বাবা নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে নৃতত্ত্বে আগ্রহ জন্মে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনে পনের বছর বয়সেই জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি ছ'মাস মেয়াদি প্রথম চাকরি — হাজারিবাগের দেহাতি কুলিবস্তিতে কলেরার মড়ক লাগায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্মী হিসেবে টীকা দেওয়ার কাজ পান। এরপর তিনি বিহারের বিখ্যাত লাল মোটর কোম্পানির বাসের নাইট সার্ভিসে কণ্ডাকটর হিসেবে হাজারিবাগ থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে যাতায়াত করতেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তীকালে 'অযান্ত্রিক' গল্প লেখেন। পরে কিছুদিন তিনি সার্কাস পার্টিতেও কায়িকশ্রমের কাজ করেছেন। 'অঙ্গদ' গল্পে সে অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। মাঝে 'হজ' যাত্রীদের টীকা দেওয়ার কাজ নিয়ে বোম্বাই এবং এডেন গিয়েছিলেন। কখনো বাড়ী থেকে উধাও হয়ে সন্ন্যাসী'র বেশে অজ্ঞাতবাস বা জিপসী দলের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গিয়েছেন। অভ্রখানির সেটারকিপার ও সুপারভাইজারিও করেছেন একসময়। আবার স্বাধীন ব্যবসার বাসনা নিয়ে কেক-পাউ(টি-ঘি-মাঘন সরবরাহের ব্যবসাও করেছেন। এই সব বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

অন্তহীন এই চলার পথে ঘুরতে ঘুরতে ঘোষ পরিবারের আকস্মিক ভাবে যোগাযোগ ঘটে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। তাঁরই প্রবর্তনায় সুবোধ ঘোষ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরীডারের কাজ পান। ছ'মাস পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় বিভাগে স্থানান্তরিত হন। সে ১৯৪০-এর ১লা জানুয়ারীর কথা। ঐ একই দিনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন সাগরময় ঘোষ। আর তখন থেকেই দুজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

সুবোধ ঘোষ প্রথম লেখেন 'প্রস্তর যুগের চিত্র কথা' (৪ঠা মে, ১৯৪০)। পরে ভবানীপাঠক ছদ্মনামে লিখেছেন 'ছোটনাগপুরের আদিবাসী' (৩০শে নভেম্বর, ১৯৪০)। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' ও পরে 'ফসিল' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর জয়যাত্রার শু(। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার

সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম প্রভৃতি লেখার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০টি।

তাঁর 'তিলাঞ্জলি', 'ত্রিযামা', 'সুজাতা', 'জিয়া ভরলি' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস খ্যাতিলাভ করেছে। তবে ছোটগল্পকার হিসেবেই সুবোধবাবুর ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা। ১৫৭টি গল্প লিখেছেন তিনি সারাজীবনে। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'জতুগৃহ', 'থিরবিজুরী', 'মনভ্রমণ' প্রভৃতি তিরিশটি গল্পগ্রন্থ এবং কতিপয় প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

৪১.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া(মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো।

কিন্তু বাধা আছে — সুকুমারের ব্রহ্মচর্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোটা তিলক ধরেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের নির্জন পুকুরঘাটে গভীর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তি(র তড়িৎস্পর্শ, (্বাসে প্র(্বাসে রক্তে(ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভলত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পু(ষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে — মুক্তি(দে, মক্তি(দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় (ণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে — বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত, তার পর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাসডাক্ত(ার বলতেন — প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিস প, ক, গায়ে মাংস লাগুক, এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম।

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোটবোন রাণু আর ঝি, তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাসডাক্ত(ারকে — যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল আর দেরী নয়।

ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে — ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও কেউ এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু, সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেন। নাও, সই কর। মুন্সেফী চাকরি ঠাট্টার নয়। সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ির বিষন্ন আবহাওয়া ক্র(মে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা

সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আ(শ্বস্ত করলেন — কিছু ভাবনার নেই(সব ঠিক হো যায়েগা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায়নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্ত(মাংসের মানুষের মেজাজ এক-আধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একবার পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ির সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগু(পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হল বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বলে — আপনাকে এবার ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন — আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রে(র দিব্যি। তা চাড়া ভাল ছবি, ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেন্ট বোধহয় সার্থক হয়ে উঠলো। ক'দিন পরেই দেখা গেল, সুকুমার কাব্য পড়ছে, কোন এক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমার যাচ্ছে। এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তি(র ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবুফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণে উড়ে চলে যায় — ধুলিধুসর সংসারে বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমার সাঁতার দিয়ে বেড়ায়! একটা বিষন্ন সুখকর বেদনা। কিসের অভাব। কাকে যেন চাই। কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘ(শ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন — নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো — কানাইবাবু?

— কি?

— মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

— নিশ্চয়। কালই চল বারাসাত। যাদব ঘোষের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে। আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব ঘোষ। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব ঘোষ অল্প পণে সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন। — ভাল করে দেখে নে সুকু, মনে যেন শেএস কোন খুঁতখুঁত না থাকে।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে। বিরাট একটা ঝকমকে বেনারসী শাড়ী আর পু(সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে বার করা চুড়ি (লি বালা ও অনন্ত, কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত(খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন — দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন — ট্যারা কানা নয়। পায়চারি করালেন — খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন — দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই।

দেখার পালা শেষ হলো। বাড়ি ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন — কি যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে বসে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এ(ত্রে মৌনং অসম্মতি ল(ণং।

— সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়। — কানাইবাবু মনের বিরক্তি(মনে চেপে রাখলেন।

পিসিমা — ছেলের আপত্তি তো হবেই। হা-ঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী-টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতা চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাসডাক্ত(ার পাত্রী দেখেছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাসডাক্ত(ার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর (চি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্ত(ার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাসডাক্ত(ারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে সেই পীড়িত মর্মের কোন অভিমান আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নির্দিষ্ট মনে কৈলাসডাক্ত(ার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়নাঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না, কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ-এর পরিচয় কৈলাসডাক্ত(ারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন-জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কৈ? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপ। ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুত করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এল।

কৈলাসবাবু বললেন — কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

— এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পট্টিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো — কৃপা করো বাবা!

— এই বুড়ীটা কে?

— এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে পশ্চিমা বেদিয়া, বসন্তে কানা হবার পর দলছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ার জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো — বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠঠি দানা হুজুর!

— আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

— ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

— আপন মেয়ে?

— হ্যাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে চুপ করে বসে আছে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূপ পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যাবে, গা শিরশির করবে। কিন্তু যদু বললো — তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালটিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানে। শহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করলো — একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁষবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রাগ বালাই নেই।

পিসিমা বললেন — যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো — আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাইজটা দিয়ে দিই। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

— হ্যাঁ দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়িও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাসডাক্তার বললেন — আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে বললেন — দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরই বিয়ে হয়ে যাবে, জানো?

ঝি উত্তর দিল — বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখানো হল দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক গোল গোল চোখ। গায়ের রঙ মেটে, কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভু(দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটা ছায়া, প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইশারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধহয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হ্যাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল, এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন — হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না। তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাসডাক্ত(ার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্র(মেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত,শি(া ও (চি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পু(ত ভটচাযি্য আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্র(মেই তেতে উঠেছে। ভটচাযি্য বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে গেলেন — নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিসটা। কুলনারীর গুণ-ল(ণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে। গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব যাচাই করে দেখতে হবে। সারাজীবনের ধর্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই চলবে না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হ্যাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবেচিন্তে, কৈলাসডাক্ত(ার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা সুশি(িতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশি। রোগা বা অতি তন্বী দুই-ই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সু(চির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশি(ার (াদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করলো রাণু। — না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋসি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারে। হাঁ-না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিংবা অতিরিক্ত(লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝ গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন — ভালই হল। জানি তো, কী কিপটে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞ মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন — পাত্রীর রাশি আর গণ খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিস নয়।

— সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ির সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেলন। — যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পাতকী রিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ। সুন্দরা রামা, রাজপদং, ধনসুখং। আর, অর কত বলবো।

— এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের কাছে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাই-করা থালাটা।

যদু কেত্থেকে এসে একসঙ্গে হুমকি দিল। — ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি। কেমন ঘাপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাসডাক্তার বললেন — যাক্, গালমন্দ করিস নে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

— আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

— চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

— কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শ্বেত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাসডাক্তার বললেন — পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম। একবার ভাব তো কানাই, কোনো ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চীজ হবে সেটা।

কানাইবাবু বললেন — যা বলছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাত-পাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড অবশ্য আছে। অ্যানথ্রপলজিস্টরা যেমন বলেন ....।

— অ্যানথ্রপলজিস্ট না চামড়াওয়ালা। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন — আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর কে প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ। মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সবে পড়ার পথ দেখলেন।

— জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে! আধুনিক হয়েছে! যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাসডাক্তার ক্রুদ্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যদাসের বাড়িতে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুশি মনে কৈলাসডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখলেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে হাসি-মস্কর করছে।

— এই রাস্কেল সব। কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে নিয়ে আর দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন — ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুরঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সবের পড়ে, বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন — সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম

পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে, সন্দেহ নেই। যেন একটি অমাবস্যা কুমারী, ঘুটঘুটে কালো। সমস্ত-অবয়বে একটা সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত হাড় আর হাতপায়ের রোমঘন পা(ষ্য পু(ষকে লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর মেঘস্তবকের দৃশ্যটা মনে পড়িয়ে দেয়। মূর্তির শিল্পীর অবশ্য খুশি হয়ে বলবেন, এ যেন এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হল। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃস্টি এ নয়(বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসা যেন জ্বলজ্বল করছে মমতার দুই চোখে।

সত্যবাবু গুরপনার পরিচয় দিলেন — বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতিবছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো — এ নিশ্চয় রা(সগণ।

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন — হ্যাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টাকট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্ত(ার তোড়জোড় করছেন। মমতারই সঙ্গে বিয়ে একরকম ঠিক। এবার একটু শক্ত(হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে(আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয়নি, তাই হল। সুকুমারের প্রকাশয বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে — সত্যদাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি, বাবার! ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগেভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাকযুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হল না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন — ঐ হৃদকুচ্চিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিমটে দিয়ে বিদেয় করে দাও না।

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্র(ম হল না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বললো — সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো।

— কোন্ দৈবজ্ঞী?

— ঐ যে বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাসডাক্ত(ার শুনলেন এ বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্র(শ্ন করলেন — কি পেয়েছ।

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন — কি হয়েছে?

— ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

— কেন দেব না?

— সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন — সুন্দরী পাত্রী।

— বেশ তবে লিখে দাও আমাকে, সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্কবিম্বাধর, আরও যা আছে সব লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মা'র মেজাজও ধৈর্য হারাবার উপত্র(ম করলো। তবু মনের ঝাঁজ চেপে নিয়ে বললেন — তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না, আমরা দেখছি।

— ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হলে আমি দায়মুক্ত(।

— হ্যাঁ।

কৈলাসডাক্ত(ার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছে। হাসপাতালে যান আসেন। (গী নিয়ে, ময়নাঘরের লাশ নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাসডাক্ত(ার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদুডোম আর নিতাই তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

— কি ব্যাপার নিতাই?

— বড় পাজি এ ছুঁড়িটা, হুজুর। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিল। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাসডাক্ত(ার বললেন — বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরে মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কয়েকটা ইটপাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাসডাক্ত(ার বললেন — সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। অনেক রাতে (গী দেখে বাড়ি ফিরতেই কৈলাসডাক্ত(ার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে-টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কৈলাসডাক্ত(ার হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হল লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত(হয়ে কৈলাসডাক্ত(ার বললেন — এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা(তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো।

কৈলাসডাক্ত(ার সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখলেন। — আমার ঘরটা সব তছতছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেক(ণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাসডাক্ত(ার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হল।

পরের দিন। দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাসডাক্ত(ারকে জানালেন — সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমার এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশের শি(ায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্ত(ার বললেন — বুঝলাম, তোমরা কল্পত(র সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

— আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

— তা, যাব।

যদুডোম এসে তখুনি খবর দিলে, তিনটে লাল এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাসডাক্ত্ার বললেন — চল রে যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে।

ময়না ঘরে এসে কৈলাসডাক্ত্ার বললেন — বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বেলে দে।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্ত্ার বললেন — রাত হবে নাকি রে যদু?

— আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাশ, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমি চিরে ফেড়ে দেব। বাকি একটা শুধু ....।

— নে কোনটা দিবি, দে! কৈলাসডাক্ত্ার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাশের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাসডাক্ত্ার চমকে উঠলেন — অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু তত(ণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাসডাক্ত্ারের প্রে্ন ফিরে এসে বললো — হ্যাঁ হুজুর, তুলসীই, সেই ভিখিরী মেয়েটা।

কৈলাসডাক্ত্ার বোকার মত যদুর দিকে কিছু(ণ তাকিয়ে রইলেন। যদু চটপট হাত চালিয়ে তুলসীর নোংরা শাড়ীটা আর গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই কৈলাসডাক্ত্ার বললেন — যাচ্ছিস কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাশটা মোছ ভাল করে। ইউক্যালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আরও একটা বাতি জ্বাল।

— ওয়ান মোর আনফর্চুনেট।

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাশে হাত দিলেন কৈলাসডাক্ত্ার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হল। কৈলাসডাক্ত্ারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোস করে সনিে্াসে নেচে কেটে চললো লাশের উপর। গলাটা চিরে দেওয়া হল। সাঁড়াশি দিয়ে পটপট করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাসডাক্ত্ার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাসডাক্ত্ার দেখলেন, নিশ্চল দুটি কণীনিকার যেন নিদা(ণ কোন অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের ে্তপটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

— ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাসডাক্ত্ার বললেন।

যদু বললো — হ্যাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

— গলা টিপে মারেনি তো কেউ? কৈলাসডাক্ত্ার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরী(া করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ(নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, ে্াসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা।

— এত লালা! মরবার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

— হ্যাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাসডাক্ত(ার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধুর, কত রূপাজীবা নটীর লাশ পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ, ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্ত(ার তাকিয়ে রইলেন — প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশির জাল।

কৈলাসডাক্ত(ার তেমনই বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন — থরে বিথরে সাজানো সারি সারি রক্তি(ম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাসডাক্ত(ার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে আর দুচোখ অপলক করে দেখতে থাকেন — খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুটধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থি(ীরে নিষিক্ত(অতি অভিরাম এই অংশপেশীর স্তবক আর ত(ণাস্থির সজ্জা ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাসডাক্ত(ার। কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে? তবুও এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন অনুরাগের তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন। যাক্

কৈলাসডাক্ত(ার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো — এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দুভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাসডাক্ত(ার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাথা একটা অজীর্ণ পিণ্ড — সন্দেহ পাউ(টি আর ... আর বেলেডোনা।

— মার্ডার।

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাসডাক্ত(ার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাসডাক্ত(ারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাসডাক্ত(ার। ছোঁ মরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত(আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন, পরিশুল্কে ঢাকা সুডৌল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে একটি শিশু এশিয়া।

আবেগে কৈলাসডাক্ত(ারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থরথর করে। যদু এসে ডাকালো — হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে তিনিই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই জিজ্ঞেস করে — এত দেরী কেন রে যদু?

— শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

৪১.৫ সারাংশ

একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির এক অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে সুকুমার। বাবা কৈলাসবাবু মফঃসল শহরের সরকারী ডাক্ত(ার। বাড়ির অন্য সকলে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের লোকজন যেমন হয়, তেমনই। ব্যতিত্র(ম শুধু সুকুমার। অকৈশোর ব্রহ্মচর্য এবং সংযম তার বাতিকে পরিণত হয়েছে। তার বাবার মতে সেটা আসলে নিরামিষভোজী সুকুমারের শরীরে প্রোটিন পদার্থের ঘাটতিজনিত কারণে। এ হেন সুকুমার পড়াশুনো শেষ করে চাকরী পাবার পথে। হবু-মুন্সেফ সায়েবের জন্য পাত্রী খোঁজ শু(হয় কাজেকাজেই। আপাদমস্তক ব্রহ্মচর্যের বর্ম-আঁটা সুকুমারকে সংসারদুরস্ত জ্ঞানগম্যি দেবার জন্য তার জামাইবাবু কানাই তাকে নভেল পড়ান, সিনেমায় নিয়ে যান জোর করে। প্রথম প্রথম সুকুমার রাগ-বিরক্তি(দেখালেও অচিরেই নমনীয় হয়ে আসে এবং বাড়ির লোকে প্রবল উদ্যমে পাত্রী দেখতে ও সুকুমারকে দেখাতে থাকেন।

৪২ ৪

মূল সমস্যার সূত্রপাত এইখানে। পিসিমা, মা, বোন, দিদি, জামাইবাবু মায় বাড়ির পুরনো পরিচারিকা অবধি প্রত্যেকেই নিজস্ব নানান মাপকাঠিতে সম্ভাব্য পাত্রীদের দোষগুণ নির্ণয় করে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করতে চান। সঙ্গে মদত জোগান কুলপুরোহিত, এমনকি এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতও। এঁদের বহুবিচিত্র চাহিদা এবং নানাবিধ মানদণ্ডে বিচারের ফলে পাত্রের পিতা হিসেবে কৈলাসবাবু একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েন। কা(র বক্ত(ব্য সুন্দরী বউ আসা দরকার, কেউ চান বংশগৌরবসম্পন্না কনে, কা(র অভিপ্রায় ভাল মতো পাওনা-থোওনা, কা(র আর কিছু। কেবলমাত্র সুকুমারেরই মন বোঝা দায়, সে যে কী চায়, তা বোঝা দুরূহ। ফলে পুতুলসাজানো পনের বছর বয়সী বনলতা মুহুরীর মেয়ে বলে নাকচ হয়ে পিসিমার কাছে(সুকুমারও মুখবার করে থাকে, অর্থাৎ অপছন্দ। দেবপ্রিয়া ভাল গান গায় বটে, কিন্তু সে হল মেদস্বিনী পৃথুলা এবং মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখচোক। সুতরাং সেও নাকচ। অনুপমা শি(তা এবং সুশ্রী, কিন্তু অতযন্ত রোগাটে চেহারার মেয়ে, তার ওপরে বাপের কৃপণতার অখ্যাতি আছে। অতএব প্রথম কারণে সুকুমারের, দ্বিতীয় কারণে পিসিমার আপত্তি। সুতরাং বাতিল সেও। মমতা স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু পু(ষালি অপেলব চেহারা, ঘোরতর কৃষ(বর্ণা। অবশ্য স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে। কিন্তু সেটা তাকে পাশমার্কা পাওয়ালো না পিসিমা, মা, রাণু, সুকুমার — কা(র কাছেই।

কৈলাসবাবুর গায়ের রংও হাকুচ কালো — মন্দ লোকে নষ্টামি করে তাঁকে ''জিভ কালো ডাক্ত(ার'' বলেও উল্লেখ করে। তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না বাড়ির লোকের কাছে সৌন্দর্যের বিচারটা ঠিক কীভাবে হয়। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে বিতণ্ডা এবং পাত্রীনির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাঁর অব্যাহতি লাভ। ওদিকে সুকুমার ছোট বোন রাণুর মারফতে প্রায়ই ভয় দেখায় যুদ্ধের চাকরী নিয়ে চলে যাবে (এই গল্প দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের সমকালীন)।

৪৩ ৪

এরই পাশাপাশি, আর একটি কিশোরী মেয়েও বারবার এসে উপস্থিত হয় কাহিনীর মধ্যে। তার নাম তুলসী — কুষ্ঠরোগী হাবু আর বেদেনী হামিদার মেয়ে।

ভিখারিনী কিশোরীটিকে কুদর্শনা বললে খুব কমই বলা হয় তার চেহারার সম্পর্কেঃ ''বছর চৌদ্দ বয়স,

তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মতো কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে-বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে চুরে গেছে, ছন্নছাড়া বি(োভে।''

এই তুলসী প্রথমবার কৈলাসবাবুর বাড়ি আসে বাপ-মায়ের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট চাইতে, যাতে ওরা মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনে থাকতে পারে। এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই তুলসীকে দেখা যায় — কৈলাসডাক্ত(ারেরও নজরে পড়ে বাড়ির আশেপাশে যে ঘোরাঘুরি করে, বসে থাকে বাগানে। একদিন তাকে দেখা গেল (িপ্ত মূর্তিতে ঢিল ছুঁড়তে — যদু ডোম এবং নিতাই সহিস ঠেকাতে গেলে তাদের হাতে কামড়েও দেয় সে। এর আগে একবার অবশ্য কৈলাসবাবুর নজরে পড়েছিল ঐ নিতাই এবং যদু তুলসীর সঙ্গে বসে-বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। আজকে একেবারে অন্য মূর্তি। এরও পরে এক সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে কৈলাসডাক্ত(ার দেখলেন চোরের মতো পা টিপে টিপে অন্ধকারে ফটক খুলে সরে পড়ছে তুলসী। তাঁর রোগী দেখার জন্য বৈঠকখানা ঘর, সুকুমারের পড়ার ঘর সব খোলা পড়ে রয়েছে। তাঁর ঘরটা তছনছ হয়ে রয়েছে, হারিয়েছে নতুন কোন বেলেডোনার শিশিটা। বিশেষ কিছু চুরি টুরি হয়নি অবশ্য।

এইসব তুলসী-কাণ্ডের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে সুকুমারের বিয়ের তোড়জোড়। স্ত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করে কৈলাসডাক্ত(ার অবশয রেহাই পেয়েছেন পাত্রী বাছাইয়ের জটিল দায়িত্ব থেকে। কারণ, বাড়ির সকলের সঙ্গে সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে তাঁর প্রবল মতানৈক্য! চুল কালো হলে সুন্দর, আর চামড়া কালো হলে নয় — এই ব্যাসকূট কৈলাসবাবু বুজে উঠতে পারেন না। অবশেযে তাঁকে বাদ দিয়েই অন্যরা সুন্দরী সুপাত্রীর সন্ধান জোটান মায়, আশীর্বাদেরও তারিখ ঠিক হয়ে যায়।

যে রাত্রে কন্য আশীর্বাদের বন্দোবস্ত হয়, ঠিক সেদিন সন্ধ্যাতেই সরকারী ডাক্ত(ার কৈলাসবাবুর ডাক পড়ে শহরের মর্গ থেকে — তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ময়নাতদন্তের জন্য। সেখানেই আচমকা, অবি(াস্যভাবে তুলসীর মৃতদেশের সম্মুখীন হলেন তিনি কৈলাস ঃ স্তম্ভিতপ্রায় বিমূঢ়তার মধ্যে কৈলাসবাবু আবিষ্কার করেন তুলসীর কুৎসিৎ-দর্শন বহিরঙ্গের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য, এবং তার পাকস্থলীর মধ্যে পাউ(টি -সন্দেশ-বেলেডোনার দলা(.... এবং একটি প্রস্তূয়মান মানব-ভ্রূণ। অপলক দৃষ্টিতে কৈলাস তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। মর্গের দরজার পাল্লার ওপর থেকে সরকারী ডোম যদু এবং ডাক্ত(ারের টমটম গাড়ির সহিস নিতাই নিজেদের মধ্যে সবিদ্রুপ-রসিকতায় মেতে ওঠে ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।''

৪১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের বি(-ষণ করতে হলে অনিবার্য ভাবেই সেটি দ্বিমাত্রিক হয়ে পড়বে। একদিকে রয়েছে এর সামাজিক দিক, অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক একটি প্রে(িত। সমাজ-মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তি(-মনস্তত্ত্ব-এ দুইয়েরই অন্বেষণ এই কাহিনীর মধ্যে করতে হয়। সুকুমারের জন্য বিয়ের পাত্রী খোঁজার আপাত-হাস্যকর পরিস্থিতির আড়ালে যে নির্মম সামাজিক মানসিকতাটা লুকিয়ে রয়েছে, তাকে আমাদের সামনে অনাচ্ছাদিত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ বারবারই। বংশকৌলীন্য, কাঞ্চনকৌলীন্য ইত্যাদি তো আছেই(তারই সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্ত(ারবাবুর বোন, স্ত্রী, কন্যা মায় প্রাচীনা পরিচারিকা পর্যন্ত (পুরোহিত-দৈবজ্ঞদের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়) যেভাবে আরো নানান চাহিদার ফর্দ বাড়িয়ে গেছেন ত্র(মান্বয়ে, তাতে তাঁরা যে ঠিক কী চান — সেটা বুঝে ওঠা নেহাৎই কঠিন। রূপ-লাবণ্য নিয়েও তাঁদের যে-বহুবিধ খুঁতখুঁতুনি, সেটাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

আসলে, আমাদের সামাজিক কাঠামোয় মেয়েদের যে এক ধরনের 'বিড়ম্বনা' (অথবা, অর্থনীতির পরিভাষায় বললে — 'ভোগ্যপণ্য', ওরফে 'কমোডিটি') বলেই গণ্য করা হয় প্রায় সর্ব(ত্রেই, এই গল্প তার সপ(একটি তাৎপর্যময় দলিল হয়ে আছে। এইজন্য কনের তথাকথিত সৌন্দর্য, তার পিতার অর্থ-সামর্থ্য এবং জাঁক করে বলার মতো পারিবারিক পরিচয়কে এত বড় করে দেখা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, মেয়েদের এই অবমাননার (না-কি, অবমূল্যায়নের) মূল হোত্রী কিন্তু অধিকাংশ (ত্রে খোদ মেয়েরাই। এই গল্পের পিসিমা-প্রমুখ পা(ব্রচরিত্রগুলি তারই প্রমাণস্বরূপ।

সমাজ-মানসিকতার এই কদর্য দিকটি যেমন এ গল্পে উদ্ঘাটিত হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে তেমনই আবার এক জাতীয় শ্রেণীশোষণও এর মধ্যে রূপায়িত। মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রে যে সবসময়েই একটা টানাপোড়েন বা স্ব-বিরোধী প্রবণতা থাকে, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এখানে স্বয়ং কৈলাসডাক্ত(ার। তিনি সৌন্দর্যের অলীক মানদণ্ড হাতে নিয়ে বিচার করেন না, ফর্দ মিলিয়ে যে রূপ লাবণ্যের হিসেব হয় না, তা তিনি স্পষ্টই বলেন এবং এই সব নিয়ে বাড়ির আর সকলের সঙ্গে তাঁর বিরোধটাও বেড়ে ওঠে ত্র(মে ত্র(মে।

এরই অনুষঙ্গে 'সুন্দর' কী — সেই অত্যন্ত জটিল প্র(্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুতপ('সুন্দর' কথাটি একান্তভাবেই আপে(ক, কেননা, একের চোখে যা সুন্দর, অন্যের চোখে তা আদৌ সুন্দর না হতেও পারে। ঠিক একই রকমের মতপার্থক্য 'অসুন্দর' বা কুৎসিৎ সম্পর্কেও ঘটতে পারে। এই সত্যটিকেই এই গল্পের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিভাজনের প্রে(তে সংঘটিত একটি গু(তর নৈতিক অপহ(বের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ব্যক্ত(করেছেন। সুন্দর কী(সৌন্দর্য কাকে বলে? কৈলাস ডাক্ত(ার নানাভাবে সে প্র(্ন কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক — ''চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত — এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে শা(ব্রত কালি দিয়ে?''

খ — (কানাইবাবু অ্যানথ্রপলজিস্টদের মত উদ্ধৃত করার চেষ্টা করে মানুষের রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে অভিমত দেবার প্রয়াস পেলে, তার জবাবে) ''আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ।''

গ. — ''প্রবালপুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সূক্ষ্ম কৈশিক জাল। ... কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে?'

মানুষের রূপের বহিরঙ্গ যেটা সেটা সাজসজ্জা, রং-পালিশে আপাত-মনোহারী করে তোলা যায়। কিন্তু বহিরঙ্গে চূড়ান্ত কুৎসিত তুলসীর ব্যবচ্ছিন্ন মৃতদেহের অন্তর্লোকে যে সুস্বাস্থ্য এবং পবিত্র রূপটি লুকিয়ে আছে মানুষের আসল সৌন্দর্য সেখানেই, কৈলাসডাক্ত(ারের এই অনুভবটুকুকে লেখকও প্রচ্ছন্ন সমর্থক জ্ঞাপন করেছেন। রূপাজীবা নটী কিংবা রূপসী কূলবধুর মৃতদেহেরও ময়নাতদন্ত করেছেন কৈলাস(তাদের কা(রই ব্যবচ্ছিন্ন শবের অভ্যন্তরে 'কুদর্শনা' এই তুলসীর মতো 'ভিন্নতর' সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পাননি। তাই, এই প্রে(তে সৌন্দর্য কাকে বলে — সে বিষয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞানকে খুঁজে পেয়েছেন কৈলাস(এবং অবশ্যই লেখকও।

এই অনুষঙ্গেই 'সুন্দরম' শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বিচার্য। এই গল্পের নাম 'সুন্দর' হলে সেই তাৎপর্য অণ্বেষণের কোনো প্রয়োজন ঘটত না। কিন্তু নাম যেহেতু 'সুন্দরম' — তাই সেই শব্দের ব্যঞ্জনা কী, 'সুন্দর' শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যানের মাধ্যমে সেটা অনুভব করা সম্ভব নয়।

''সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম''—ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় এই কথাটি বহু-প্রচলিত, বহুল-প্রচারিত। যা 'সত্য', তাই মঙ্গলময় (অর্থা, 'শিব') এবং সেটিই হল সুন্দর। সত্য, শুভ এবং সুন্দরের এই অভিন্নতার ধারণাকে এখানে তির্যক বিদ্রূপে খানখান্ করে ভেঙে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। এই সমাজের পরিপ্রে(তে 'সত্য' মানেই যে — 'সত্য' মাত্রেই যে, মঙ্গলসূচক নয়, সুন্দরও নয় — পরো(ইঙ্গিতে সেই নির্মম কথাটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন গল্পের এমন শিরোনামের মাধ্যমে। তুলসীর প্রতি যে ভয়ঙ্কর এক অন্যায় করা হয়েছে, কাহিনীর শেষ পর্বে তো তা দিবালোকের মতোই সুস্বচ্ছ। কিন্তু সেই 'সত্য' (কঠিন নিশ্চয়!)কিন্তু মঙ্গলপ্রদ কিংবা সুন্দর নয়। 'সুন্দরম নামের এমন তির্যক প্রয়োগের সাহায্যে তিনি সেটিই মর্মান্তিক (্-ষের সঙ্গে ব্যক্ত(করেছেন। যে তিক্ত(বিদ্রূপ যদু ডোমের কণ্ঠে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠেছে গল্পের শেষ পংক্তি(তে। ঠিক তারই সমধর্মী একটি ধিক্কার যেন এই 'সুন্দরম' শব্দের মাধ্যমে সুবোধবাবুর কলমে ঝড়ে পড়েছে।..... হয়ত 'সুন্দরম।'' কিংবা 'সুন্দরম?' এই চেহারায় এ গল্পের নামকরণটা করলে তাঁর অভীষ্ট (্-ষের ব্যঞ্জনাটুকু সোচ্চারভাবে ফুটে উঠত। কিন্তু তা না করে, তিনি ওটুকু পাঠকের অনুভবশক্তি(র ওপর ভরসা রেখে সাদামাটা ভাবেই শুধু 'সুন্দরম' লিখে ছেড়ে দিয়েছেন।

গল্পের মধ্যে আরও একটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ সংকেত অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষ। তুলসীর গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে একটি অপ্রত্যাশিত বিশেষণে মণ্ডিত করেছেন তিনি ঃ (শিশু) এশিয়া। এই আপাত অসংলগ্ন শব্দটি ব্যবহার করে তিনি আর এক ব্যঞ্জনায় শোষণ ও প্রতারণার বি(দ্ধে বাঙ্ময় হয়েছেন। ধর্ষিতা এবং প্রতারিতা ভিখারিণী কিশোরী তুলসীর ভ্রূণদেহী সন্তানকে ''এশিয়া'' বলে অভিহিত করে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে লাঞ্ছিত এশিয়ার মানুষের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। গভীর তাৎপর্যময় এই শব্দটি এখানে কাহিনীকে একটা অন্যতর মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতিকালে সুবোধ ঘোষের গল্পসমগ্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ''এশিয়া'' শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে ''আশা'' রূপে। এই রূপান্তরণ কেন এবং কীভাবে, তার কিছু ব্যাখ্যানেই। এটা সুবোধবাবুর অনুমোদিত কি-না, সেটিও অনুল্লেখিত। এর ফলে গল্পের একটি বিশিষ্ট ভাবমাত্রার ব্যঞ্জনা পরিবর্তিত হয়েছে অবশ্যই। 'আশা' কেবলমাত্র তুলসীর অবোধ-ভাবনার প্রে(তেই ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু 'এশিয়া'-র ভাবগত সংকেত সুদূরবিস্তারী।]

এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সুকুমার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। তার (আপাত) ব্রহ্মচর্যের ভড়ং করা তারপরে দু-চারটে নভেল পড়ে এবং সিনেমা দেখেই জীবনের ভোগ-সুখ ইত্যাদিতে আগ্রহী হওয়া, রূপসী পত্নী না-জুটলে যুদ্ধে সার্ভিস নেবার ভয় দেখানো বাড়ির লোককে এবং রূপ-গুণ-বংশকৌলীন্য-বিত্তস্বাচ্ছল্য ইত্যাদির জন্য তাঁদের বাছাবাছির বিলম্ব সইতে না-পেরে কুৎসিতা ভিখারিণী কিশোরী (যে, কুষ্ঠরোগীর কন্যাও বটে) তুলসীকে প্রলুব্ধ করে তার সর্বনাশ করা এবং পরিশেষে কেলেংকারি ঢাকতে তাকে গর্ভবতী অবস্থায় খুন করা — ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সুকুমারের চরিত্রের ভণ্ড, কামুক এবং হিংস্র রূপগুলি পরের পর ঝিলিক দিয়ে যায়। সুবোধবাবুর অসামান্য শিল্পকৃতিত্ব এইখানেই যে, গল্পের শেষ পংক্তি(তে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সুকুমারের এই মুখোসটা খসে পড়ে না। একটা বিচিত্র উৎকণ্ঠা কাহিনীর শেষ পর্যন্ত তিনি টানটান করে রেখেছেন — বিশেষত তুলসীর অপঘাতে মৃত্যু এবং তার গর্ভে মৃত ভ্রূণ দেখার পর থেকে। অথচ এই

কাহিনী শু(হয়েছিল বেশ একটা হালকা পরিহাস বিজল্পিত ভঙ্গীতেই — বিশেষত সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের হাস্যকর ভড়ঙের বর্ণনার অনুষঙ্গে।

বারংবার পাত্রী দেখানোর যে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই গল্পের মধ্যে ত্র(মান্বয়ে করা হয়েছে, সেখানেও এই ধরনের ব্যঙ্গ মনস্কতার ইঙ্গিত মেলে। আবার তারই পাশাপাশি সুকুমারের পিসি, মা, বোন, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ প্রমুখের কথাবার্তার মাধ্যমে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ঠিক কথখানি অবমাননা সইতে হয় এবং ছেলের বিয়ে উপল(কেমনভাবে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যার মালিকানা অর্জনের লোলুপ অপচেষ্টা চলে, তারও নিখুঁত এবং তীব্র প্রতিবেদন করেছেন গল্পকার। আর সেই সূত্রেই এইসব পার্শ্বচরিত্রগুলির ছোট-ছোট স্কেচ এঁকে গেছেন তিনি। মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যেসব হীনতা, লোভ এবং দৈন্য লুকিয়ে থাকে, তাদেরকে অনাবৃত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ এভাবেই।

মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের আরেকটি দিকের প্রতিনিধি হলেন কৈলাস ডাক্ত(ার। তিনি উদারচেতা, স্পষ্টবক্ত(া এবং সংস্কারবিমুক্ত(মানুষ। পরোপকারী, দয়ালু এবং সংবেদনশীল এক জনহিতব্রতী চিকিৎসক। সুকুমারের ব্রহ্মচর্যের নামে আধ্যাত্মিক ভাবালুতার ভণ্ডামি, বাড়ির সকলের হীনতা-দীনতা-লোলুপতা এবং নারীর রূপ-সম্পর্কে অনির্দেশ্য কিছু বিচারপদ্ধতির অসারতা — এই সমস্ত কিছু ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ, নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর ছেলের বিপ্রতীপ মে(তে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত, মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যে একটি প্রতিবাদী প্রগতিশীল মানসিকতা ত্রি(য়াশীল থাকে, সেটারই প্রমাণ হিসেবে কৈলাসবাবুকে গ্রহণ করলে ভুল হবে না।

আর্ত-সামাজিকভাবে অবরবর্গীয় — সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় সাক-অল্টার্ন-বলে গণ্য যে — চরিত্রগুলি গণ্য এই কাহিনীতে, তাদেরমধ্যে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ অবশ্যই তুলসী। অবশ্য এই গল্পের কোথাও তার মুখে একটি শব্দও শোনানি আমাদেরকে লেখক, যদিচ পরিণামে তার মাধ্যমেই তারসপ্তকে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে লেখকের অভীপ্সিত বক্ত(ব্য। দারিদ্র্য, (ুধা, যৌবনতৃষ(া এবং বোধবুদ্ধির (ীণতা — এই সব কিছু একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে তার 'প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।'' তুলসীর জীবনের যে ক(ণ এবং ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি, তার জন্য প্রত্য(ভাবে দায়ী অবশ্যই সুকুমার, পরিণাম বোধহীন, নাবালিকা তুলসীর দায় সেখানে অনেক লঘু। তবে, সুকুমার এখানে একক নয়(তুলসীর এই মর্মান্তিক পরিণতির অন্তরালে ডাক্ত(ারবাবুর বাড়ির সকলের দায়িত্বও কিছু কম নয়। তাঁদের খুঁতখুঁতানি এবং মাত্রাছাড়া 'লাভের' আকাঙ্খার ফলে সুকুমারের বিয়েটা পেছিয়েছে যতই, ততই ভিতরে-ভিতরে সুকুমারও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য সুকুমারের 'রূপ-তৃষ(া'-ও তার বিয়ের ফুল ফোটার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

এইখানেই মানবচরিত্রের এক বিচিত্র এবং অব্যাখ্যেয় রহস্য লুকিয়ে আছে। বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতা প্রমুখ মেয়েরা তার পছন্দ হয়নি তার এবং তার বাড়ির লোকের বিচারে 'সুন্দরী' নয় বলে। অথচ সর্বজনীন নিরিকেই কুরূপা বলে গণ্য তুলসীকে উপল(করে তার কাছে প্রত্যাশিত সুশালীন নৈতিকতা এবং সংযমবোধ চুরমার হয়ে গেল — যার মর্মন্তুদ পরিণাম তুলসীর গর্ভবতী হওয়া এবং (বিষাক্ত() সুখাদ্যের প্রলোভনে অপঘাতে মরা।

তুলসী হতদরিদ্র এবং একান্তই অসহায় একটি পরিবারের কন্যা হওয়ার ফলেই সুকুমারের প(তাকে এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল যে, তাতে সংশয় নেই। ফলত, সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে সুকুমারের যে-বাছবিছার দেখা গেছে, সেটা যে নেহাৎই ঠুনকো এবং ভিত্তিহীন তাও এর থেকে প্রতীয়মান হয়েছে।

তুলসীকে লালসার শিকার বানিয়ে, তারপর সমস্ত ঝামেলা এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে সুকুমার তাকে বেলেডোনা খাইয়ে হত্যা করে — এটাকে শ্রেণীগত চরিত্রল(ণ বললে হয়ত একটু বেশিই বলা হবে। তবে খুন করার ব্যাপারটুকু ছাড়া বাকিটার মধ্যে মধ্যবিত্তের ধূর্ততা প্রতিভাত হয়েছে যে, সেটা অবশ্য বলাই যায়। মনোবিজ্ঞানীরা 'কপ্রোফিলিয়া' বলে এক ধরনের বিকারের কথা বলেন, যার ফলে যৌনাবদমন-জনিত কাররে হতকুৎসিতের প্রতিও এক সময়ে আকর্ষণ জন্মাতে পারে। সুকুমারও তেমন মনোবিকারগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

অবরবর্গীয় অন্য চরিত্রদুটির মধ্যে নিতাই সহিসকে মোটামুটিভাবে অপ্রাসঙ্গিক বলেই গণ্য করা যায়। কিন্তু যদু ডোম সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। কাহিনীর সমাপ্তির মুহূর্তে তার অনুচ্চ কণ্ঠে যেন স্বয়ং মহাকাল তাঁর ত্রু(দ্ধ বিদ্রুপ এবং ঘৃণা উদ্‌জীবিত করে দিয়েছেন ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে রে।'' শেষ বিচারে সে, নিতাই এবং তুলসী যে একই শ্রেণী সীমানার অন্তর্গত এটা মনের গভীরে যদু ডোমের অনুভব না করার কথা নয়। সেই অনুভূতি, রূপান্তরিত হয়েছে তুলসীর প্রতি আর্থ-সামাজিক শ্রেণীতে প্রবল এক সহানুভূতিতে। তাই কৈলাসডাক্ত(ার যত ভাল লোকই হোক না কেন, শেষ বিচারে তিনিও তো সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ—যারা চিরকালই যদু-তুলসীদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে আসছে একদিকে(অন্যদিকে নির্মর্মভাবে শোষণও করে আসছে। যদুর এই তীব্র ঝাঁঝের বিদ্রুপ তাই কেবলমাত্র আঁশটে রসিকতা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ ঘৃণা এবং প্রতিবাদেরও দ্যোতক বলেই বুঝে নিতে হবে। মুখে হরহামেশা ''হুজুর' বলে কৈলাসকে সম্বোধন করে বিনয় এবং সম্ভ্রম দেখানোর ভাণ করে সে ঠিকই(কিন্তু প্রকৃতপ(সেই নম্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অতলান্ত ঘৃণা এবং আত্রে(াশ। সেটা 'ব্যক্তি(' কৈলাসের প্রতি নয়, তিনি যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত, তার প্রতি। 'ব্যক্তি(' কৈলাসকে (সম্ভবত) যদু-নিতাইদের অপছন্দ করার কোনো প্রত্য(হেতু নেই, কিন্তু সে-মুহূর্তে তাদের মনে পড়ে তিনি 'সুকুমারের বাবা'— তখনই মনের গহনে তাঁর সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট বিরূপতা সঞ্জাত হয়। সুকুমার যেহেতু এখানে প্রতিভাত হচ্ছে, তাদের কাছাকাছি থাকা আর্থ-সামাজিক স্তরভুক্ত(একটি নিরপরাধ কিশোরীর ধর্ষক এবং হত্যাকারী রূপে, তখন সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিই তাদের এক ধরনের অসহায় কিন্তু অপরিমিত আতীব্র আত্রে(াশ বিষিয়ে দেয় সমস্ত মানসিকতাটাকে(আর সেটারই প্রকাশ ঘটেছে যদূর ঐ (-যতিভ্ত(টিপ্পনীর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে। মাত্র একটি ছয় শব্দের বাক্যের মাধ্যমে এমন একটা প্রচণ্ড শ্রেণীবিরোধের মানসকিতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়াটা নিঃসন্দেহে লেখকের অসাধারণ দ(তার দ্যোতনা বহন করে।

এই আলোচনা সাঙ্গ করার আগে আরো একটি বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলা বাঞ্ছনীয়। তুলসীর ময়নাতদন্তের যে-অণ্বিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ, তার মধ্যে একই সঙ্গে ভাষাকুশলী এক শিল্পীর দ(তা এবং শারীরবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন মানুষের পাণ্ডিত্য সুসমন্বিত হয়ে উঠেছে। ডাক্ত(ারী শাস্ত্রে প্রচলিত লাতিন নামগুলির বদলে চরক-সুশ্রুতের প্রাচীর গ্রন্থে প্রাপ্য। সংস্কৃত শারীরবিদ্যাকেন্দ্রিক শব্দাবলীর এই সুষ্ঠ প্রয়োগ — মৃতদেহের ময়নাতদন্তের মতো একটা বীভৎস রকমের অস্বস্তিকর ব্যাপারকেও শিল্পরসেমরিডত করতে পেরেছে। পাঠকের কাছে সেটা অবশ্যই অতিরিক্ত(একটা পাওনা অবশ্যই।

৪১.৭ অনুশীলনী

◻ বিস্তৃত আলোচনামূলক ◻

১) ‘সুন্দরম’ শিরোনামটি গল্পের প((কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বলুন।

২) সুন্দরের সংজ্ঞা কৈলাস ডাক্ত(ারবাবুর উপলব্ধিতে কীভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে, আলোচনা ক(ন।

৩) ‘সুন্দরম’ গল্পে সমাজ-মন এবং ব্যক্তি(মন কীভাবে দুয়েরই বিকলন করেছেন সুবোধ ঘোষ, আলোচনা ক(ন।

৪) সুকুমার ছেলেটি শয়তান, না মনোবিকারগ্রস্থ — বুঝিয়ে বলুন।

৫) তুলসীর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য সুকুমারদের পরিবার এবং সুকুমার স্বয়ং, কার দায়িত্ব বেশি, কার কম, আলোচনা ক(ন।

৬) ‘সুন্দরম’ গল্পের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কূটেষণা প্রবলতর শক্তি(হিসেবে প্রতীত হলেও, আর্থ-সামাজিক বিভেদের শ্রেণীচেতনাও কম গু(ত্বপূর্ণ নয় — আলোচনা ক(ন।

৭) কৈলাস ডাক্ত(ার এবং তাঁর ছেলে সুকুমার, মানুষ হিসেবে দুটি পরস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থানে আছেন(একই পরিবেশে, একই পরিবারের পরস্পরার মধ্যে থেকেও এই বৈপরীত্য কেন, বুঝিয়ে বলুন।

৮) ‘‘সুবোধ ঘোষের ভাষাশৈলী একটি অনন্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে ‘সুন্দরম’ গল্পে।’’ —আলোচনা ক(ন।

◻ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ◻

১) যতগুলি মেয়েকে সুকুমারের সম্ভাব্য পাত্রী হিসেবে দেখা হয়েছিল, তাদেরকে কী কী ছুতো দেখিয়ে অমনোনীত করা হয়?

২) সুকুমারের ‘ব্রহ্মচর্য’ কীভাবে চলত, বলুন।

৩) ‘পু(তমশাই’ এবং ‘দৈবজ্ঞী’ সুকুমারের বিয়ে সম্পর্কে কী কী অভিমত দিয়েছিলেন বলুন।

৪) কানাইবাবুর তালিমে সুকুমারের কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

◻ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ◻

১) ‘‘অদ্ভুত আত্মিক শক্তি(র রেচকস্পর্শ’’ সুকুমার কোথায় কোথায় অনুভব করেছিল?

২) সুকুমার সম্পর্কে তার বাবা কী বলতেন?

৩) কানাইবাবু সুকুমারকে কোন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

৪) বনলতারা কোথায় থাকত?

৫) সিনেমায় কার নাচ পছন্দ করত সুকুমার?

৬) তুলসীরা কোথায় থাকতে চেয়েছিল?

৭) অনুপমা সম্পর্কে রাণু কী মন্তব্য করেছিল?

৮) সুকুমার কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেছিল?

৯) কৈলাসবাবুর ডিসপেনসারী থেকে কী হারিয়েছিল?

১০) সুকুমারের কার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ের ঠিক হয়?

১১) কৈলাস ডাক্ত(ার কিসের পাকা জহুরী?

১২) পোখরাজের দানার সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

১৩) 'সুন্দরম' গল্পের ঘটনাকাল কখন?

১৪) তুলসী কবে মারা গিয়েছিল?

১৫) তুলসী কার মেয়ে?

১৬) ক্লোমরসে মাখা কিসের পিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল?

৪১.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের শেষাংশ অনুসরণে উত্তর ক(ন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের প্রথম অংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৪) মূলপাঠ এবং আলোচনার প্রথম পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরী ক(ন।

৫) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার সাহায্যে উত্তর দিন।

৬) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার সাহায্যে উত্তর দিন।

৭) কৈলাস ও সুকুমারের বিপ্রতীপ অবস্থানের কারণ দু'জনের বয়স ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা। প্রথমজন ডাক্ত(ার ও লাসকাটা তার অন্যতম কাজ। তিনি মন-নিয়ে চর্চার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকের

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনকে দেখেছেন। সুকুমার অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণার বশবর্তী। আশৈশব সনাতন জীবন যাপন করেছে। কতকগুলি অন্ধ প্রত্যয় নিয়ে। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে শেষে উপলব্ধি করেছে —মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

৮) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ে 'সুন্দরের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ অবলম্বনে উত্তর তৈরী ক(ন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ অনুসরণে বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতাকে দেখে সুকুমারের আচরণ ব্যাখ্যা করে উত্তর দিন।

২) ৩),৪) — মূলপাঠ অনুসরণে উত্তর ক(ন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন। অবশ্যই একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখবেন।

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) সুবোধ ঘোষ — *শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাজার্য সম্পাঃ)*

২) অরিন্দম গোস্বামী — *সুবোধ ঘোষ ঃ কথা সাহিত্য*

৩) উত্তম ঘোষ — *সুবোধ ঘোষা ঃ বড় বিস্ময় জাগে*

৪) অ(ণ কুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের পুত্তলিকা*

৫) সরোজ মোহন মিত্র — *ছোট গল্পের বিচিত্র কথা।*

৬) সুবোধ ঘোষ — *অযান্ত্রিক শিল্পী ঃ সম্পাদনা উত্তম পুরকাইত*